সূর্যের ভর হ্রাস পায়!
আবিরা আফরোজ মুনা ৩
রক্ত
সাইদুল হোসাইন ৫
কীভাবে বের করা হয়েছিলো আলোর বেগ?
আবিরা আফরোজ মুনা ১০
আমরা কি সব অতীত দেখি?
মোঃ ফয়সাল ১২
About Antibiotic Act against Virus
Zonathon Hasda ১৩
পৃথিবী গ্রহে কি উলটো মানুষই এলিয়েন?
আবিরা আফরোজ মুনা ১৪
মহাকাশচারীরা কেন কমলা ও সাদা রঙের স্যুট পড়েন?
আবিরা আফরোজ মুনা ১৭

বাচ্চার মেধা কার থেকে আসে?
আবিরা আফরোজা মুনা ১৮
Time And Reason Of Death
Zonathon Hasda ১৯
গণিতে দক্ষতা বৃদ্ধিতে বৈদ্যুতিক শক!
আবিরা আফরোজা মুনা ২১
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় ইঁদুর ব্যাবহার করা হয় কেন?
আবিরা আফরোজা মুনা ২২
পদার্থের তিন অবস্থা
মোঃ শাহরিয়ার আলম ২৪
আমরা পৃথিবী থেকে ছিটকে যাই না কেন?
মোঃ শাহরিয়ার আলম ২৫
শেষ অঙ্ক কত?
মোঃ শাহরিয়ার আলম ২৬
নেমোফোবিয়া
মোঃ শাহরিয়ার আলম ২৭
মানসিক চাপে চুল কেন পাকে?
আবিরা আফরোজ মুনা ২৯
ইঁদুর বিড়ালের খুনসুটি!
আবিরা আফরোজা মুনা ৩১
সুর্য
Rhr Rony ৩২
বিষাক্ত ব্যাঙের বিস্তার ঠেকিয়ে দিচ্ছে ইঁদুর !
আবিরা আফরোজা মুনা ৩৩
ব্যতিক্রমী এক গ্রহ
Mohammad Arafat Hossain Sami ৩৫
রহস্যময় আরোরা
Mohammad Arafat Hossain Sami ৩৬
বুধ গ্রহ ছোট হয়ে যাচ্ছে !
আবিরা আফরোজা মুনা ৩৭

সূর্যের ভর হ্রাস পায়!

আবিরা আফরোজা মুনা

বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের একটি উল্লেখযোগ্য ফলাফল হচ্ছে ভর ও শক্তিকে অভিন্নরূপে দেখা। ভরের সাথে যেমন শক্তি জড়িত, তেমনি শক্তির সাথে ভর জড়িত। অর্থাৎ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে ভর ও শক্তিকে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ বলে প্রমাণ করা যায়। একটি ট্রেন যখন হুইসেল বাজাতে বাজাতে কারোর দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন সেই শব্দের তীব্রতা তার নিকট অনেক বেশি মনে হয়। আবার যখন তাকে অতিক্রম করে চলে যায় তখন শব্দের তীব্রতাও অনেক কমে আসে। আমরা জানি, শব্দ চলে তরঙ্গের আকারে। ট্রেন যখন হুইসেল বাজাতে বাজাতে লোকটির দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন সেই শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্যগুলো ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে তার কানে প্রবেশ করে। আবার যখন তাকে অতিক্রম করে দূরে চলে যায় তখন ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটে। ঘটনাটির গাণিতিক ব্যাখ্যা দেন বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান ডপলার। তাই তাঁর নামানুসারে ঘটনাটিকে ডপলার ক্রিয়া বলা হয়। ডপলার ক্রিয়া কেবল শব্দের ক্ষেত্রেই নয়, আলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা, আলো এক প্রকার তরঙ্গ। দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য একেক রঙের জন্য একেক রকম। লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি বেগুনী আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম।

একটি আলো যখন আপেক্ষিক গতিতে দূরে সরে যাবে তখন সেই উৎসের আলো লোকটির কাছে লাল এবং যখন কাছে আসতে থাকবে তখন নীলাভ মনে হবে। নীল আলোর কম্পাঙ্ক বেশি, তাই নীল আলোর শক্তি, লাল আলোর তুলনায় বেশি। একটি স্পেস শীপে চড়ে যদি একজন নভোচারী খুব বেশি বেগে সূর্য অভিমুখে যেতে থাকে তবে আপেক্ষিকতার নীতি অনুসারে নভোচারীর কাছে মনে হবে যেন সূর্যই তার দিকে সেই বেগে অগ্রসর হচ্ছে। ফলে উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হবে যেন সূর্য থেকে নির্গত আলোকরশ্মি তড়িৎচৌম্বক বর্ণালীতে নীলের দিকে সরে গেছে। আবার

যখন তিনি সূর্যকে অতিক্রম করে যাবেন তখন মনে হবে যেন সূর্য থেকে নির্গত আলোকরশ্মি তড়িৎচৌম্বক বর্ণালীতে লালের দিকে সরে গেছে।

এর অর্থ, সূর্যকে অনেক বেশি শক্তি ব্যয় করতে হচ্ছে। কিন্তু সূর্যের শক্তিতো সীমিত। তাহলে এই অতিরিক্ত শক্তি আসে কোথা থেকে। এর একটা কারণ হতে পারে সূর্যের আপেক্ষিক গতি (নভোচারী সাপেক্ষে)। এখানেও সমস্যা আছে। সূর্য তখনই তার শক্তি ছেঁড়ে দিবে যখন গতি মন্থর হতে থাকবে। নভোচারী তো চলছে সমবেগে, অর্থাৎ গতি মন্থর করার কোনো প্রশ্নই আসে না। সূর্যের গতি যেহেতু নভোচারী সাপেক্ষে সেহেতু সূর্য নিজেও তার গতি কমাতে পারছে না। তাহলে উপায়? হ্যা, একটা উপায় অবশ্য আছে বটে এবং সেটা হচ্ছে- সূর্যের ভর কমিয়ে। সূর্য যেহেতু আপেক্ষিক বেগ কমাতে পারছে না তাই তার অতিরিক্ত শক্তি আসছে সূর্যের ভর থেকে। আমরা জেনেছি, গতিশীল বস্তুর বেগ যতো বাড়ে ভরও ততো বাড়ে। এক্ষেত্রে সূর্য শক্তি ক্ষয় করছে আবার গতিও কমছে না। তাই বলা হচ্ছে, সেই শক্তি আসছে স্বয়ং সূর্যের ভর থেকেই।

কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব? কারণ পৃথিবী কাঠামো থেকে দেখলে সূর্যকে স্থির বলেই মনে হয়। অথচ আমরা পুরো কাহিনীটা তৈরি করেছি নভোচারী সাপেক্ষে সূর্যকে গতিশীল বিবেচনা করে। আসলে আপেক্ষিকতার নীতি থেকে বলা যায়, যে ঘটনা নভোচারীর জন্য বৈধ, সেটা পৃথিবীতে স্থির সকলের জন্যই বৈধ। সূর্য আলো বা তাপ উৎপন্ন করে নিউক্লিও ফিউশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে এবং এতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় হাইড্রোজেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেও সূর্য ও অন্যান্য তারার শক্তির উৎস সম্পর্কে জানা যায়নি। তখন মনে করা হতো, সূর্যের শক্তির উৎস হচ্ছে মহাকর্ষ। আইনস্টাইনের ভর-শক্তি সম্পর্কের পথ ধরে জানা সম্ভব হলো যে, আলো ও তাপশক্তি উৎপন্ন হয় ফিউশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং এতে সূর্য তার ভর হারায়। সূর্য প্রতিনিয়ত তার ভর হারাচ্ছে শক্তিতে রুপান্তরনের মাধ্যমে এবং গণনা করে দেখা গেছে, সূর্য প্রতি সেকেন্ডে চার মিলিয়ন টন ভর হারাচ্ছে।

রক্ত

সাইদুল হোসাইন

গ্রীষ্মের প্রখর রোদে অনেকটা আনমনে হেঁটে যাচ্ছ তুমি। রাস্তার পাশে কোন কিছুর সাথে লেগে মূহুর্তের মধ্যে তোমার হাতের একপাশে খুব বিশাল নয় আবার খুব ছোট নয়, মোটামুটি সাইজের একটা ক্ষত সৃষ্টি হলো। কিন্তু আকাশ থেকে সূর্য মহাশয় এমন তাপ দিচ্ছে যে, গরমের জ্বালায় সেদিকে তোমার চোখ যায় নি। কি আর করার। বাসায় এসে দেখা গেল যা হওয়ার তাই হয়েছে!কাজ সেরেছে; বেশ খানিকটা কেঁটে সেখান থেকে রক্ত বাবাজী মহানন্দে টুপটুপ করে পড়ছে। তখন ঘটনাটা অনেকটা অতিপ্রাকৃতিক মনে হতেই পারে।তবে মজার ব্যাপার হলো অতিপ্রাকৃতিক বলতে আসলে বাস্তবে কিছুই নেই। সাধারণ মানূষতো বটেই পাশাপাশি যারা বিজ্ঞানমনস্ক তারা সবাই জানে অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা বলতে কোনো কিছুর কখনো অস্তিত্ব ছিল না আর থাকবেও না।তবে যারা একটু বেশি বিজ্ঞানমনস্ক, যাদের মাথা সবসময় কৌতূহলে ঠাসা থাকে তাদের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে রক্ত আসলে কি? আজকে আমরা এই প্রশ্নটার উত্তর খোজার চেষ্টা করব। পাশাপাশি রক্ত সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব। তো চল শুরু করা যাক।

মানুষ সবসময় কৌতূহলী প্রানী। কৌতূহল প্রবণতা মানুষের মজ্জাগত। প্রাচীন কাল থেকে সব কিছুর ন্যায় রক্ত সম্পর্কে মানুষ জানাত চেষ্টা করে আসছে। অতিপ্রাচীন কালে মানুষ মনে করত রক্তই হচ্ছে প্রান, রক্তই জীবন তথা জীবনের উৎস। এর পেছনে বেশ ভালো একটা যুক্তি আছে।যুক্তিটা অনেকটা এমন, যখন বনে মানুষ শিকার করতে যেত তখন তারা দেখেছিল কোন প্রানী শিকারের পর তা থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে প্রানীটি একসময় মারা যায়। তারা আরো দেখেছিল গাছ থেকে হাত ফসকে ধপাস করে আছাড় খেয়ে মানুষের শরীর থেকে রক্তপাত হয়। এক সময় এই রক্তপাত আর থামানো যায় না। ফলাফল মৃত্যু। এজন্যইতো রক্ত মানে জীবন। এরকম বাস্তব জ্ঞান সম্পন্ন ধারনা কি

কখনো ভূল হতে পারে? অবশ্যই না। তবে তাদের এই ধারণা যে শুধুমাত্র ভূল ছিল তা নয়, এটা ছিল মহা ভূল। একটু সাধারণ ভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায়, যারা স্বাভাবিক ভাবে মারা যায় তাদের দেহেতেও রক্ত থাকে। তাহলে রক্ত মানেই কিভাবে প্রান হয়? অবশেষে মানুষ রক্ত মানেই প্রান,রক্ত মানেই জীবন এই ধারনা থেকে বেড়িয়ে এলো। তবে তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল রক্ত বেঁচে থাকার জন্য অনন্য আবশ্যক একটা উপাদান।

খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ সালের কথা। তখন গ্রিক সমৃদ্ধির চুড়ান্ত শেখরে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় তাদের বিচরন। এমন সময় গ্রীক চিকিৎসকহিপোক্রিটাস বলে বসলেন মানব দেহের সুস্থতায় চারটি তরলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশাল গুরুত্বপূর্ণ। মহা গুরুত্বপূর্ণ। এই চারটির মধ্যে তিনি রক্তকে একটি বলে দাবি করলেন। হিপোক্রিটাসের মতবাদের বিরোধীতা করার জন্য তখন কেউই ছিল না। তাই হিপোক্রিটাসের ছাত্র, অনুসারী, সাধারণ জনতা সকলে তা মেনে নিল। তবে হিপোক্রিটাসের কথা শতভাগ সত্য ছিল না। এভাবে অনেক সময় বয়ে গেল। নদীতে জল গড়ালো। এবার জ্ঞানবিজ্ঞানে সমৃদ্ধিলাভ করল মিশর। স্থাপিত হলো আলেক্সান্দ্রিয়া লাইব্রেরি। জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজ দরবা তথা জ্ঞান গৃহ ছিল এই আলেক্সান্দ্রিয়া। এই আলেক্সান্দ্রিয়া লাইব্রেরিতে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি মানব দেহ কেঁটে নানা গবেষণা করা হতো। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে গ্রিক চিকিৎসক প্রাক্সাগোরাস মানবদেহের রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে শিরা,আর ধমনী আবিষ্কার করলেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো প্রাক্সাগোরস ধমনীকে রক্তবাহী নালী মনে করেননি।তিনি মনে করেছেন ধমনী হলো বায়ুথলি বা বায়ু বাহিনালী। তাই তিনি এর নাম দেন আর্টারিজ। আর্টারিজ নামক এই গ্রীক শব্দটার মানেই বায়ুথলি। সত্য বলতে এতে প্রক্সাগোরাসের দোষ ছিল না। বেচারা মৃতদেহ ব্যাবচ্ছেদ করেছিল। আর মৃত দেহে শিরা রক্তে পরিপূর্ণ থাকলেও ধমনি ফাঁকা থাকে। তবে হিপোক্রিটাসের ধারনার মতো এই ধারনা সকলে মানলেও এই ধারনা বেশি দিন স্থায়ী ছিল না। আলেক্সান্দ্রিয়ার অন্যতম বিজ্ঞানী হিরোফিলাস দেখান যে, ধমনী আসলে বায়ু না, রক্ত বহন করে। এই হিরোফিলাস ছিলেন আবার প্রাক্সাগোরাসের ছাত্র। বলে রাখা ভালো হিরোফিলাসই ২০০০ বছর আগে আবিষ্কার করেছিলেন হৃৎপিণ্ড নয় বরং মস্তিষ্ক আমাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে। এভাবে কালের বিবর্তনে মানুষ রক্ত, রক্ত সংবহনতন্ত্র সম্পর্কে অনেক কিছুই জানল।

সেই খ্রস্টিপূর্ব অব্দ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমরা রক্ত সম্পর্কে একটু একটু করে অনেক কছুই জেনেছি । আজ আমাদের কাছে রক্ত সম্পর্কে রয়েছে অনেক তথ্য। চল দেখি রক্ত সম্পর্কে জানা অজানা বিষয় নিয়ে এবার একটু আলোচনা করি। (গ্যারান্টি দিচ্ছি বেশি গভীরে যাব না। স্বাভাবিক ও অতি সাধারণ ভাবে আলোচনা চলবে)প্রায়ই টিভি ও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আমরা একটা কথা শুনে থাকি, 'একজন মুমূর্ষু রোগীর জন্য রক্তের প্রয়োজন। রক্তের গ্রুপ উমুক - তুমক পজেটিভ বা নেগেটিভ। আসালে এইযে রক্তের গ্রুপ বলে একটা ব্যাপার আছে এটা আবার কি?দেখি বের করা যায় নাকি এই প্রশ্নের উত্তর।

কালের পরিক্রমায় একসময় মানুষ যখন বুঝতে পারল অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে যায়। তখন থেকেই মানুষ বিকল্প পদ্ধতির খোঁজ শুরু করে যে, কিভাবে রক্ত ক্ষরণের মাধ্যমে তৈরি হওয়ার রক্ত সল্পতা বা ঘাটতি মেটানো যায়। মানুষ দিন রাত এক করে ভাবতে শুরু করল।অনেকে পরিক্ষা নিরিক্ষা পর্যন্ত শুরু করে দিল। কিভাবে এই সমস্যার একটা সমাধান করা যায়। কিভাবে কিভাবে কিভাবে? অবশেষে সতেরো শতকে রিচার্ড লেয়ার নামের এক বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হলো। তিনি বললেন যদি কোন প্রানীর রক্ত মানুষের দেহে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাহলে হয়তো

মানুষটা রক্ত সল্পতা থেকে রেহাই পাবে। যেই কথা সেই কাজ। ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু কোনো লাভ হল না। তবে রিচার্ড লেয়ারের মাথায় কিছুতেই ধরেল না যে, কেন এই পদ্ধতিতে কাজ হচ্ছে না। রক্তের প্রয়োজনে আমিতো রক্তই দিলাম। অন্যকিছু তো আর দেই নি।তবে হলো না কেন?

এই হলো না কেনর উত্তর নিয়ে এলেন ইংরেজ বিজ্ঞানী জেমস বান্ডেল। তিনি বললেন লেয়ার সাহেবতো মানুষের শরীরে অন্য প্রাণীর রক্ত প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছেন তাই তিনি ব্যার্থ হয়েছেন। যদি মানুষের শরীরে মানুষের রক্ত ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তবেই এই রক্ত আদান প্রদান প্রক্রিয়া কাজকরবে। শুধু এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি তিনি। আরো বললেন নির্দিষ্ট প্রজাতির রক্ত নির্দিষ্ট প্রজাতিতে কাজ করবে।যেমন গরুরটা গরুতে,মানুষেরটা মানুষের মাঝে। এবার পালা হলো মানুষের দেহে মানুষের রক্ত ভরার।

বান্ডেল সাহেব মানুষের দেহে মানুষের রক্ত ভরছেন। কি অপূর্ব কাজ! দেখা গেল এই পদ্ধতি কাজ করছে। খুব ভালোই কাজ করছে।কিন্তু মাঝে মাঝে কাজ করছে না। আর যখন কাজ করছে না তখন মানুষ সুস্থ হওয়ার বদলে মারা পরছে বেশি। কিভাবে মারা যাচ্ছে? প্রথমে রক্ত দেহে প্রবেশ করছে। তারপর তা গ্রহণকারীর রক্তের সংস্পর্শে এলে গুটি গুটি আকারে দানার মতো তৈরি হচ্ছে। এক সময় এই দানাগুলো জমাট বাধছে। ফলে থমকে যাচ্ছে দেহের রক্ত পরিবহন কাজ। আর আজন্যই হচ্ছে মৃত্যু। তাই বান্ডেলের এই কাজ খুব বেশি গ্রহনযোগ্যতা পেল না।

আহারে কি একটা বাজে অবস্থা। সবাই একটু একটু করে আগায় কিন্তু একটা যথাযথ সমাধান কেউই বের করতে পারে না।এখন সবচেয়ে জরুরি কাজ হল একটা যথাযথ সমাধান বের করা। আর এই জরুরি কাজটা করলেন মহান কার্ল লেন্ডস্টেইনার। একে বারে গবেষণা লব্দ জ্ঞন দিয়ে রক্ত সম্পর্কে কথা বার্তা বললেন।চলুন দেখি কি বলেছিলেন এই মহান বিজ্ঞানী ।

ল্যান্ডস্টেইনার দেখলেন মানব দেহে রক্তের লোহিত রক্ত কণিকায় অ্যান্টিজেন ও রক্ত রসে অ্যান্টিবডি বলে দুই ধরনের প্রটিন থাকে।তিনি এই অ্যান্টিজেন আর অ্যান্টিবডির উপর ভিত্তি করে রক্তকে বিভিন্ন গোত্রে ভাগ করলেন। আমরা পেলাম রক্তের বিভিন্ন গ্রুপ। দেখা গেল যার রক্তের গ্রুপ A তার দেহে রয়েছে A অ্যান্টিজেন ও b অ্যান্টিবডির। যার রক্তের গ্রুপ B তার দেহে রক্তে রয়েছে B নামক অ্যান্টিজেন ও a অ্যান্টিবডি। আর AB নামক এক ধরনের রক্তের গ্রুপ পাওয়া গেল যাতে কোন অ্যান্টিবডির বিন্দুমাত্র উপস্থিতি নেই তার বদলে AB উভয় অ্যান্টিজেন এই রক্তে থাকে। আর গ্রুপ O এর ক্ষেত্রে তার ঠিক উল্টোটা। এখানে কোনো অ্যান্টিজেন নেই আছে ab এই দুই ধরনের অ্যান্টিবডি। আর যখন একই অ্যান্টিজেন একই অ্যান্টিবডির সংস্পর্শে আসে তখনই ঘটে বিপত্তি। যেমন: যদি অ্যান্টিজেনA আর অ্যান্টিবডি a একসাথে মিলে তাহলে কেল্লাফতে। রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত। তবে এখানেই শেষ নয়। কালের পরিক্রমায় বিজ্ঞানীরা আরও জানলেন রক্তে রেসাস ফ্যাক্টর (Rh Factor) নামের এক ধরনের প্রটিন বিদ্যমান থাকে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো সব রক্তে আবার Rh ফ্যাক্টর থাকে না। যাকগে সমস্যা নেই। বিজ্ঞানীরা সমাধান বের করলেন। যাদেররক্তে Rh ফ্যাক্টর থাকে তাদের রক্তের গ্রুপের সাথে পজেটিভ শব্দটা যুক্ত করে দিলেন। আর যাদেরটায় Rh ফ্যাক্টর নেই তাদেরটায় নেগেটিভ। ধর তোমার রক্তে অ্যান্টিজেন হিসেবে আছে A আর অ্যান্টিবডি হিসেবে আছে b পাশাপাশি তোমার রক্তে Rh ফ্যাক্টর বিদ্যমান তারমানে তোমার রক্তের গ্রুপ A + ve(Aপজেটিভ) ।

এই একটুখানি থাম। কিছুক্ষণ আগে আমরা একটি শব্দ উচ্চারণ করেছি। বল দেখি শব্দটা কি? লোওওওহিত রক্ত কণিকা। চল এবার এটা সম্পর্কে কিছু কথা বলা যাক।

একটা ধাক্কা খাওয়ার জন্য তৈরি হও। আমাদের রক্তের রং হলো হলুদ! থাম থাম। বেশি লাফালাফি কর না। আমাদের

রক্তের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো রক্তরস। রক্ত রসের মধ্যেই রক্তের সবকিছু বসবাস করে।এই রক্ত রসের রং হলো হলুদ। কিন্তু এই রক্ত রসে এক ধরনের জিনিস থাকে যার জন্য আমরা রক্তকে লাল দেখি। আর এই জিনিসটাই হলো লোহিত রক্ত কণিকা।হুম সত্যিই বলছি।

কিছুদিন হলো মাইক্রোস্কোপ বের হয়েছে। চারদিকে অনেক হৈ হৈ রৈ রৈ অবস্থা। এই যন্ত্রের নিচে ছোট ছোট জিনিস পত্র রাখলে নাকি তা বিশাল বড় দেখায়। সব বিজ্ঞানীরা এই মাইক্রোস্কোপের পিছনে লেগেছেন। কেউ এটা দিয়ে কোষ আবিষ্কার করছেন,কেউবা পাতার শিরা উপ শিরা। কিন্তু কেউ এখনও এর নিচে রক্ত রেখে দেখেননি। কেউ যেটা করেননি এবার সময় হলো সেটা করার। ইতালির বিজ্ঞানী মারসেলো ম্যালপিজি সাহেব মাইক্রোস্কোপের নিচে রক্ত রাখলেন। রেখেই দেখা পেলেন লোহিত রক্ত কণিকার।তবে তিনি এ সম্পর্কে কোনো তথ্য লিখে রেখে জাননি। কিন্তু তার অনেক পরে এক ডাচ বিজ্ঞানী এই লোহিত রক্ত কণিকার বিবরণ লিখলেন। তাই লোহিত রক্ত কণিকা প্রথম কে দেখেছেন এই নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে এন্টোনি ভন লিউয়েনহুক নামের অন্য আরেক ডাচ বিজ্ঞানী এই রক্ত কণিকা নিয়ে প্রথম যথাযথ গবেষণা করেছিলেন। (কথিত আছে সে সময় নাকি লিউয়েনহুকের চেয়ে ভালো মাইক্রোস্কোপ অন্য কারো কাছে ছিল না।)

লোহিত রক্ত কণিকা দেখতে অনেকটা দ্বিঅবতল। এতে কোন নিউক্লিয়াস থাকে না। এতে হিমোগ্লোবিন নামক একধরনের রঞ্জক বস্তু থাকে। অনেকে বলেন আসলে এই হিমোগ্লোবিনের জন্যই নাকি রক্ত লাল হয়। আমাদের দেহের সর্বত্র অক্সিজেন পরিবহনের কাজ করে এই হিমোগ্লোবিন।কিভাবে করে? এরা অক্সিজেনের সাথে অক্সি-হিমোগ্লোবিন নামক অস্থায়ী যৌগ গঠন করে। পরবর্তীতে এই যৌগের মাধ্যমে অক্সিজেন দেহের প্রতিটি কোষে যায়।আর কোষ থেকে আবার অক্সিজেন ব্যাবহারের মাধ্যমে তৈরি হয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড। এই কার্বন-ডাই-অক্সাইডও রক্তের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে ফুসফুসে ফিরে আসে। তবে অক্সিজেন যেমন হিমোগ্লোবিনের সাথে মিশে প্রবাহিত হয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড তেমনি প্রবাহিত হয় না।এটা রক্তে বাই-কার্বনেট হিসেবে ঘুরাঘুরি করে।

মানব দেহে রক্তে শুধু লোহিত কণিকাই থাকে না আরো থাকে শ্বেত রক্ত কণিকা অণুচক্রিকা এসব। তবে অন্যসব রক্ত কনিকার চেয়ে আমাদের দেহে এই লোহিত রক্ত কণিকার সংখ্যাই বেশি।প্রপ্তবয়স্ক পুরুষের দেহে ৫০ লাখের মত আর প্রপ্তবয়স্ক নারীদের দেহে ৪৫ লাখ লোহিত রক্ত কণিকা থাকে। আমাদের দেহের বিভিন্ন হাড়ের শেষাংশে এদের জন্ম হয়। এরা আবার মারাও যায় ১২০ দিন পর। (আহারে অনেক কম আয়ু!)

শ্বেত কণিকা কী? শ্বেত কণিকা হলো দেহের প্রহরী। তারা জীবানু ধ্বংস করে। এরা যে পদ্ধতিতে জীবাণু ধ্বংস করে তার একটা গালভর্তি নাম আছে। ফ্যাগোসাইসিস।আপনার মনে হতেই পারে, যদি আমার দেহে অস্বাভাবিক ভাবে খুব বেশি পরিমানের শ্বেত রক্ত কণিকা থাকে তাহলে বুঝি আমি আর অসুস্থ হব না। দেহের সব জীবাণু মরে আমি জীবাণুমুক্ত হয়ে যাব। কিন্তু এটা ভূলেও মনে করবেন না। যদি দেহে অস্বাভাবিক হারে শ্বেত রক্ত কণিকা বৃদ্ধি পায় তবে অন্য কণিকার ভারসাম্য নষ্ট হয়। এই অবস্থাকে বলা হয় রক্তের ক্যান্সারযাকে আমরা আদর করে লিউকেমিয়া নামে ডাকি। এবার আসি অণুচক্রিকা নিয়ে।

অনূচক্রিকার কাজ হলো রক্ত জমাট বাঁধানো। যখন আপনার হাত কেঁটে যায় তখনই শুরু হয় অণুচক্রিকার খেলা। তারা আছে বলেই আমাদের হাত পা কাঁটলে কিছুক্ষণ পর রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। তা না হলে কি যে হতো কেউই জানে না! পৃথিবীর যত রক্তক্ষয়ী ইতিহাস আছে তার সবই চমৎকার ভাবে সামলেছে অণুচক্রিকা। যদি তা না হতো তবে ঐ ইতিহাস গুলো রক্তক্ষয়ী না হয়ে হয়ে যেত মহা রক্তক্ষয়ী। ইতিহাসের এমনই একটা রক্তক্ষয়ী অধ্যায় হলো দ্বিতীয় বিশ্ব

যুদ্ধ। তখন ব্লু ব্লাড তত্ত্ব খুব জনপ্রিয় ছিল। কথায় কথায় সম্ভ্রান্ত শ্বেতাঙ্গরা বলত "we are the blue blood. "কি অবিশ্বাস্য ব্যাপার! শ্বেতাঙ্গ সম্ভান্তদের দেহের রক্ত আবার নীল হয় নাকি? সত্য বলতে শুধু তাদের নয় সমগ্র মানব জাতির শরীরে নীল রক্ত রয়েছে!

আমরা সবাই জানি সমগ্র দেহে অক্সিজেন ছড়িয়ে যায় রক্তের মাধ্যমে।ধমনী এ কাজটি করে।মানে ধমনী নামক যে নালীটি আছে তা আমাদের দেহের সর্বত্র অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে।তবে মনে রাখতে হবে আমাদের দেহে শুধু অক্সিজেনই নয় পাশাপাশি কার্বন-ডাই-অক্সাইড নামক গ্যাসও রক্ত পরিবহন করে। একাজে রক্ত যে নালীটিব্যাবহার করে তার নাম শিরা। আর আমাদের দেহে শিরাতে যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড সম্পন্ন রক্ত থাকে তার রং হয় নীল(blue)। এজন্য যারা সম্ভ্রান্ত শ্বেতাঙ্গ এবং যাদের দেহ কখনো রোদে পুড়ে তামাটে হয়নি তাদের দেহে এই শিরা গুলো চামড়ার উপর নীলচে দেখায়। তাই তারা বলে তারা নীল রক্তের মানূষ। কিন্তু প্রকৃত অর্থে আমাদের সকলের দেহেই blue blood আছে। এটা এক কথায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমানিত। তাই কৌতুক করে বলা যাতেই পারে বিজ্ঞান আমাদের সত্যের পথে চলার মাধ্যমে সাম্যবাদ স্থাপনে সাহায্য করে। বিজ্ঞান বলে ঐ সম্ভ্রান্ত শ্বেতাঙ্গরাই bule blood নয় তোমরাও blue blood! এবার প্রশ্ন হলো আমাদের অনেকের শিরা কেটে যখন রক্ত বের হয় তখন ঐ রক্তের রংতো নীল হয় না। তখন তা থাকে স্বচ্ছ লাল। এমনটা কেন হয়?

আগেই বলেছি কার্বন-ডাই-অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত শিরাতে থাকে তাই তা নীল দেখায়। কিন্তু যখন তা দেহ থেকে বের হয় তখন বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসে। আর লাল হয়ে যায়। কি চমৎকার ব্যাপার!!!

হুম আসলেই চমৎকার। এমন হাজারো চমৎকার, অবিশ্বাস্য রহস্যের বসবাস আমাদের দেহে। যার কিছু কিছু আমরা আজ উন্মোচন করেছি বাকিটা কাল নয়তো পরশু করব। এভাবে করতে করতে এগিয়ে যাবে বিজ্ঞান।সমৃদ্ধ হবে আমাদের সভ্যতা।এরই ধারাবাহিকতায় আমরা পাব পুরোপুরি বিজ্ঞানময় বাস্তব সম্মত সচেতন একটা পৃথিবী। ঐ দিনটির আশায় থেকে আজকের পোস্ট এখানেই শেষ

তথ্যসূত্র

1. Wikipedia
2. জীববিজ্ঞান বোর্ড বই নবম- দশম শ্রেণির
3. রক্ত বিষয়ে আমরা যেভাবে জানলাম (আইজ্যাক আসিমভ) অনুবাদক আবুল বাশার

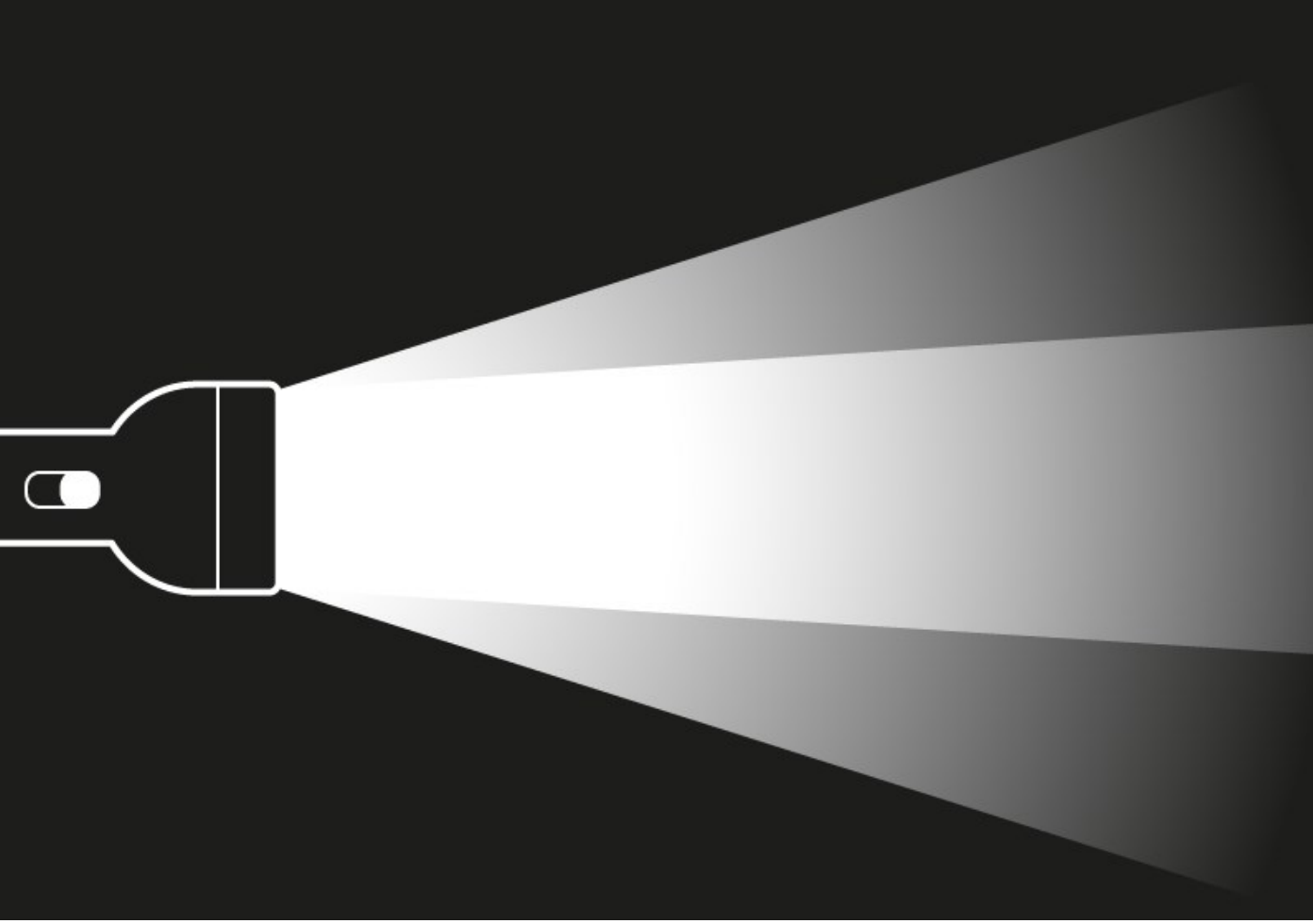

কীভাবে বের করা হয়েছিলো আলোর বেগ?

আবিরা আফরোজা মুনা

হঠাৎ করে সূর্য যদি ভ্যানিশ হয়ে যায় ,,,পৃথিবীবাসীর সেটা জানতে লেগে যাবে পাক্কা ৮ মিনিট। মানে, পৃথিবীর যে পাশে সূর্যের আলো পড়ছিলো, আরো ৮ মিনিট ধরে সেই পাশ আলোকিত হয়ে থাকবে। অনেকের কাছে ব্যাপারটা ধাক্কার মত আসে। দৈনন্দিন জীবনে তো এমন কিছু ঘটে না। লাইট জ্বালালেই দুম করে আলো জ্বলে ওঠে, একদম সাথে সাথে। লাইট নেভালে তো ৮ মিনিট পরে নেভে না। তাহলে, সূর্যের আলো এরকম ধোঁকাবাজি কেন করবে? উত্তরটা সরল – সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে প্রায় ৮ মিনিট ২০ সেকেণ্ডের মত সময় লাগে। আলোর গতি অনেক, কিন্তু অসীম না। আলোর সেই গতি প্রথমবার কিভাবে বের করা হয়েছিলো? কে করেছিলো?

মহাবিশ্বে সবকিছু বেশ নিয়ম মেনে চলে। যেমন, পৃথিবী তার নিজ অক্ষের ওপর প্রায় ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসে। এজন্য ২৪ ঘণ্টায় দিন-রাত হয়। কখনো ২৬ ঘণ্টা বা কখনো ২২ ঘণ্টা, এরকম হয় না। পৃথিবীর কক্ষপথ দেখতে কেমন, কেন এমন – নিউটন তো এইসব নিয়মগুলো পর্যবেক্ষণ করে সেরা কিছু সূত্র দিয়ে দিলেন। সেগুলো দিয়ে সুন্দরমত মহাকর্ষ ব্যাখ্যা করা গেলো – অমুক ভরওয়ালা কোনো বস্তু তমুক ভরওয়ালা কোনো বস্তুর চারপাশে কিভাবে,

কত গতিতে, কতক্ষণে ঘুরবে, এগুলো আগের চেয়ে অনেক সূক্ষ্মভাবে হিসাব করা গেলো। যেমন চাঁদ ঠিক কোন সময়ে পৃথিবীর কক্ষপথের কোথায় থাকবে, সেটার হিসাব নিখুঁতভাবে করা গেলো।

গোল বাঁধলো বৃহস্পতির চাঁদ নিয়ে, আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে চাঁদগুলোর (একাধিক) কক্ষপথ নিয়ে। নিউটন হিসাব বলছে, চাঁদগুলো বৃহস্পতিকে কেন্দ্র করে ঘোরার অমুক সময়ে পৃথিবী থেকে চাঁদগুলোকে অমুক জায়গায় দেখা যাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেলো, ঘটনা সেভাবে ঘটছে না। কোনো কোনো সময় একদম টাইমমত চলে আসে, কখনো সময়ের ৮ মিনিট আগেই চলে আসে, আবার কখনো ৮ মিনিট পরে আসে। নিউটন ব্যাটা কি তাহলে ভুল করলো?

ডেনমার্কের জ্যোতির্বিদ ওলে রয়মার (Ole Rømer) ১৬৭৬ সালে দেখলেন, কাহিনীতে আরেকটা তথ্য যোগ করার দরকার। শিডিউলের (মানে, হিসেব করে বের করা সময়ের) আগেই চাঁদগুলোকে দেখা যায়, যখন বৃহস্পতি ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর কাছাকাছি চলে আসে। আর শিডিউলের পরে আসে, যখন বৃহস্পতি পৃথিবীর চেয়ে দূরে থাকে। তিনি আসল পর্যবেক্ষণটা করেছিলেন বৃহস্পতির একটা চাঁদ ইয়ো (IO)-এর চন্দ্রগ্রহণ নিয়ে। সেই সময় তিনি অদ্ভুত একটা দাবি করলেন – যেখানে ঘটনাটা ঘটে, সেখান থেকে পৃথিবীতে ঘটনাটা পৌঁছাতে একটু সময় লাগে। কতটুকু দূরে থাকলে কতটুকু সময় লাগে, সেই হিসেব থেকে তিনি তখনকার যুগের সবার চোখ কপালে তুলে দেয়ার মত একটা প্রস্তাব করলেন – আলো জিনিসটার গতি অসীম না, তারও একটা গতি আছে। আর সেই গতিটা হলো, সেকেন্ডে ২ লাখ ২০ হাজার কিলোমিটার। যারা আসল গতিটা (সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার) জানেন, তারা চ্যাঁচামেচি শুরু করার আগেই জানিয়ে দিচ্ছি, আলো নিশ্চয়ই তখন ভিন্ন গতিতে চলতো না। ওনার দাবিটা আসল গতির চেয়ে ২৬% কম ছিলো। কারণ সোজা, তিনি হিসেবে কিছু ভুল করেছিলেন। ভুল বলাটা আসলে ঠিক হবে না। আসলে তখন যে যন্ত্রপাতি ছিলো, সেগুলো দিয়ে উনি যতটুকু হিসেব করতে পেরেছিলেন, সেটাই করেছেন। এরপর আস্তে আস্তে যন্ত্রের সংবেদনশীলতা বেড়েছে, আরো নিখুঁত হয়েছে। এবং আমরাও পেয়েছি আলোর বেগের সূক্ষ্ম হিসাব। আমরা জানতে পারলাম আলোর বেগ 3×10^8 ।

আমরা কি সব অতীত দেখি?

মোঃ ফয়সাল

কি অবাক হচ্ছেন এমন শিরোনাম দেখে! আসলে আমরা যা দেখি তার সব কিছুই কিন্তু অতীত! কি বিশ্বাস হচ্ছে না তো? চলুন আগে জেনে নেয়া যাক আমারা কিভাবে দেখতে পাই?

আমরা তখনি কোন কিছুকে দেখতে যখন সেই বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পরে। চলুন একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, আমরা যে সূর্যকে দেখচ্ছি তা কিন্তু বর্তমান সূর্যের অবস্থান নয়। কারণ আমরা আগেই বলেছি যে কোন বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পরে তবেই আমরা সেই বস্তুকে দেখতে পারি। আমরা বর্তমানে যে সূর্য দেখচ্ছি তা ৮মিনিট আগের সূর্য। আর সূর্য থেকে আমাদের পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ই মিনিট। ধরুন সূর্য যদি হঠাৎ আলো দেওয়া বন্ধ করে দেয় তাহলে আমরা কিন্তু তা সাথে সাথে বুঝতে পারব না। আমরা প্রায় ৮ মিনিট পর বুঝতে পারব যে সূর্য আর আলো দিচ্ছে না। আবার আসা যাক দূরের কোন গ্রহের দিকে। ধরুন কেপলার ২২ বি যা আমাদের পৃথিবীর মত একটা গ্রহ। যা আমাদের সৌর মন্ডল থেকে মাত্র ৫৮৭ লাইট ইয়ার দূরে। আমরা যদি আলোর গতিতেও কোন স্পেসক্রাফট নিয়ে যাই তাহলে আমাদের ওই গ্রহে যেতে ৫৮৭ বছর সময় লাগব। তার মানে আমরা যদি ২০২০ সালে ঐ গ্রহের উদ্দেশ্যে রওনা দেই তাহলে আমরা ঐ গ্রহে যেতে তাহলে আমরা ঐ গ্রহে যেতে ২৬০৭ সালে গিয়ে পৌছাব। তার মানে আমরা এখন রওনা দিলে আলোর গতিতে গিয়েও এমন হতে পারে যে ২৬০৭ সালে গিয়ে দেখতে পারব যে হয়ত ঐ গ্রহের কোন অস্তিত্ব নাও থাকতে পারে। কারণ এই ৫৮৭ বছর ঐ গ্রহ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আবার আসি আমাদের প্রতহ্য জীবনে আমরা যে বস্তু দেখি তা থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে আসে এবং চোখ তা আমাদের ব্রেইনে সেই ডাটা প্রেরণ করে আর আমাদের ব্রেইনে থাকা নিউরন গুলো গ্রহণ করে বিশ্লেষণ করে তার ফলে আমরা সেই বস্তুকে দেখতে পাই। কিন্তু তা আমাদের সাথে এত দ্রুত ঘটে যে যা এক সেকেন্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ সময়। যা এত নগন্য সময় যে তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। তো এখন কি মনে হচ্ছে যে আমরা আসলেই সব অতীত দেখি।

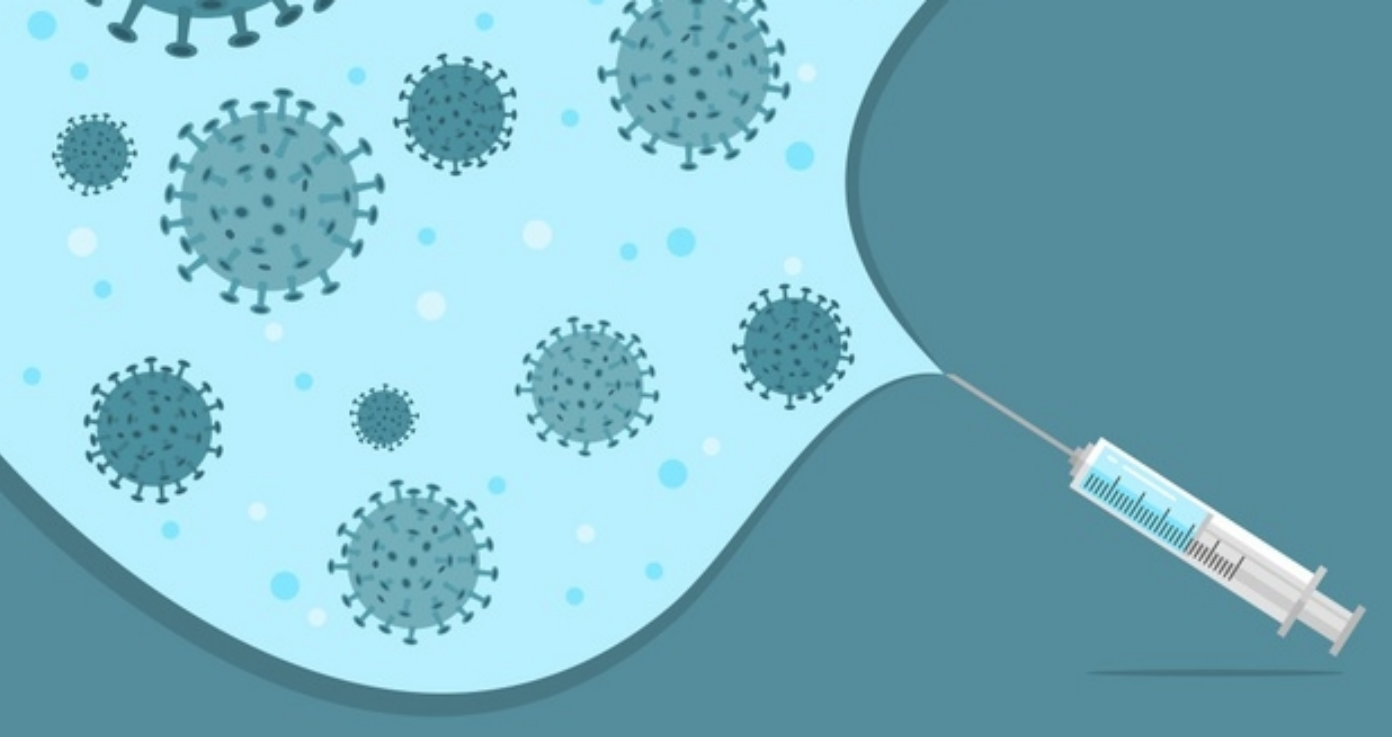

About Antibiotic Act against Virus

Zonathon Hasda

অ্যান্টিবায়োটিক, বাংলা অর্থ অনুজীব নাশ বা অনুজীব বৃদ্ধিরোধকারী ঔষধ। আমাদের সবারই জানা আছে যে স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং প্রথম Antibiotics আবিষ্কার করেন।

Antibiotics নাম শুনেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, এটি এমন এক ধরনের জৈব রাসায়নিক ঔষধ যা অনুজীবদের বিরুদ্ধে কাজ করে, এদের বৃদ্ধি প্রতিহত করে এবং এদেরকে ধ্বংস করে দেয়। বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক হতে Antibiotics আবিষ্কার করা হয়। আর তাই বিভিন্ন

Antibiotics, বিভিন্ন অনুজীবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ভাবে ক্রিয়া করে। এটি সাধারণত শত্রু ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরের পেপ্টাইডোগ্লাইকেন সংশ্লেষণ বন্ধ করে দেয়। সাধারণত ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর কিছু উৎসেচক ধারন করে। যারা পেপ্টাইডোগ্লাইকেনের স্তরকে ভাঙে যার ফলে নতুন পেপ্টাইডোগ্লাইকেনের স্তর সৃষ্টি হতে পারে। কোষের নিজের এমন কিছু পদার্থ আছে যারা এই প্রকৃয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং সবসময় পেপ্টাইডোগ্লাইকেনের স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হতে না পারে। Antibiotics এর জন্য অনেক ক্ষেত্রেই এইসব নিয়ন্ত্রক পদার্থ কোষ থেকে হারিয়ে যায় বা ধ্বংস হয়ে যায়। যার কারণে কোষস্থ উৎসেচক পেপ্টাইডোগ্লাইকেন স্তর ভাঙতে থাকে। ফলে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি প্রতিহত হতে থাকে এবং ধ্বংস হয়ে যায়।

তাছাড়াও Antibiotics বিভিন্ন ভাবে ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে দেয়। যেমন Antibiotics কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর ছিদ্র করে দেয়। ব্যাকটেরিয়ার রাইবোসোমে প্রোটিন সংশ্লেষণে বাধা প্রদান করে। আবার নিউক্লিক এসিড সংশ্লেষণেও বাধা দেয়। এভাবে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি প্রতিহত হয়ে যায় এবং এক সময় ব্যাকটেরিয়া মারা যায়।

এটাই Antibiotics এর ক্রিয়া-কৌশল।

পৃথিবী গ্রহে কি উল্টো মানুষই এলিয়েন!

আবিরা আফরোজা মুনা

ভিনগ্রহ থেকে উড়ন্ত চাকতির মতো মহাকাশযানে চড়ে পৃথিবীর নির্জন প্রান্তরে নেমে আসে এরা। এদের শরীর মানুষের মতো। প্রকাণ্ড মাথার নিচে ছোট ধড়, সরু লিক লিকে হাত পা, বড় বড় টানা টানা কালো চোখ। এরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও প্রযুক্তির দিক থেকে আমাদের চেয়ে কয়েক আলোকবর্ষ এগিয়ে এরা পৃথিবী থেকে অনেক দূরে থাকা গ্রহের বাসিন্দা। এদের নাম 'এলিয়েন'। বর্তমান পৃথিবীর প্রতি পাঁচজন মানুষের মধ্যে একজন এই এলিয়েনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন।

এলিয়েন আছে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং আগেই বলেছিলেন, এলিয়েন আছে, অবশ্যই আছে। নাসার গবেষকেরা কেপলার টেলিস্কোপের সাহায্যে এমন ২০টি গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন, যাদের মধ্যে সম্ভবত প্রাণ আছে। নাসার প্রথম সারির বিজ্ঞানী অ্যালেন স্টেফান, বিজ্ঞানী সিলভানো পি কলম্বানো, বিজ্ঞানী থমাস জুরবিউকেন বিভিন্ন সময় বলেছেন আমরা এলিয়েনের খুব কাছাকাছি আছি।

কিন্তু সম্প্রতি একটি চাঞ্চল্যকর বিতর্ক উপস্থিত হয়েছে এলিয়েন নিয়ে। একদল বিজ্ঞানী রীতিমতো যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন জীবের সৃষ্টি মহাকাশে এবং মানুষই এলিয়েন। এই মতবাদ পালে হাওয়া পেয়েছে, কারণ পৃথিবীতে জীবন ও মানবজাতির উৎপত্তি সম্পর্কে সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত এখনও মেলেনি।

পৃথিবীতে জীবনের সৃষ্টি কীভাবে হয়েছিল! জীবের উৎপত্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন মতবাদ থাকলেও। বেশিরভাগ বিজ্ঞানীরা এত দিন বলে এসেছেন সমুদ্রের পানিতে আনুমানিক ৩০০ কোটি বছর আগে জীবনের আবির্ভাব ঘটেছিল। কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন মিলে বিভিন্ন ধাপে তৈরি করেছিল প্রথম প্রাণ নিউক্লিওপ্রোটিন।

সেখান থেকে প্রোটোভাইরাস-ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়া-প্রোটোজোয়া প্রভৃতি ধাপ ঘুরে সৃষ্টি হয়েছিল এককোশী ক্লোরোফিল যুক্ত জীব ও বহুকোশী প্রাণীর। এককোশী ক্লোরোফিল যুক্ত জীব থেকে সৃষ্টি হয়েছিল উদ্ভিদের।

সম্প্রতি একদল বিজ্ঞানী বলেছেন জীবের উৎপত্তি সমুদ্রের জলে নয় মহাকাশে! শেফিল্ড ইউনিভারসিটির একদল বিজ্ঞানী ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ২৭ কিমি ওপরে থাকা বায়ুমণ্ডলীয় স্তর স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে কতগুলি বেলুন পাঠান। বেলুনগুলি ফিরে আসার পর স্তম্ভিত হয়ে যান তাঁরা। বেলুনের গায়ে লেগে ছিল কিছু আণুবীক্ষণিক জীব। পৃথিবীতে যাদের অস্তিত্ব নেই। বিজ্ঞানীরা বলছেন এই জীবগুলির উৎপত্তি মহাকাশে।

পরীক্ষাটির শেষে শেফিল্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ওয়েনরাইট বলেছেন, কোনো পদ্ধতিতেই পৃথিবী থেকে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের উচ্চতায় এই জীবগুলির যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি এগুলি মহাকাশের জীব এবং মহাকাশেই জীবের সৃষ্টি হয়েছিল। মহাকাশ থেকে এখনও প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে জীব আসছে। আমাদের চারপাশে অনেক জীবই আছে যারা এসেছে মহাকাশ থেকে।

আর একদল বিজ্ঞানীও পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন, মহাকাশ থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড পৃথিবীতে আসতে পারে ধূমকেতুর আঘাতের সঙ্গে। এই মতবাদে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীরা বলছেন জীবন সৌরজগতে ছড়িয়ে আছে।

বলেন কী, আমরাই এলিয়েন! জীবের উৎপত্তি তাহলে সমুদ্রে হয়নি! এই প্রশ্নে যখন পৃথিবী তোলপাড় এর মধ্যেই বোমা ফাটিয়েছেন আমেরিকার ইকোলজিস্ট ড. এলিস সিলভার। তিনি তাঁর Humans are not from Earth: a scientific evaluation of the evidence বইটিতে রীতিমতো যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে মানুষ পৃথিবীর জীব নয়।

অন্য জীবদের মতো মানুষের সৃষ্টি পৃথিবীতে হয়নি। কয়েক লক্ষ বছর আগে অন্য গ্রহ থেকে মানুষকে পৃথিবীতে ছেড়ে যাওয়া হয়েছিল। সিলভার বলেন, মানুষের শরীরে থাকা অনেক ত্রুটি বুঝিয়ে দেয়, পৃথিবী আমাদের নিজের গ্রহ নয়। কিন্তু জীববিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন নিম্নশ্রেণীর প্রাণী থেকে বিবর্তিত হতে হতে পৃথিবীর সেরা প্রাণী মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল।

ড. সিলভারের থিওরির কিছু ঝলক তাঁর থিওরি দাঁড়িয়ে আছে মানুষের শারীরতত্ত্বর ও পৃথিবীর অন্য জীব ও মানুষের পার্থক্যের ওপরে।

● ড. সিলিভারের মতে, অন্য প্রজাতির জীবের প্রায় সব প্রয়োজন মিটিয়ে দেয় আমাদের এই মিষ্টি পৃথিবী। তাই, যারা মানুষকে ভিনগ্রহ থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তারা ভেবেছিল, পৃথিবীর অন্য প্রাণীদের মতো মানুষের জীবনযাত্রার সব প্রয়োজন মিটিয়ে দেবে পৃথিবী। কিন্তু অদ্ভূতভাবেই তা হয় না।

● মানবজাতিকে গ্রহের সবচেয়ে উন্নত প্রাণী বলে মনে করা হয়। আশ্চর্যের কথা, মানুষই হচ্ছে গ্রহের সবচেয়ে খাপছাড়া ও পৃথিবীর জলবায়ুতে টিকে থাকার জন্য সবচেয়ে অনুপযুক্ত প্রাণী।

● বেশিরভাগ প্রাণী সারাদিন, যতক্ষণ খুশি, দিনের পর দিন রৌদ্রস্নান করতে পারে। কিন্তু আমরা কয়েক ঘণ্টার বেশি রোদে থাকতে পারি না কেন!

● সূর্যের আলোয় আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। অন্য প্রাণীদের ধাঁধায় না কেন?

● প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে পাওয়া বা গজিয়ে ওঠা খাবার মানুষ খেতে অপছন্দ করে কেন!

● অদ্ভুতভাবে মানুষের মধ্যেই প্রচুর ক্রনিক রোগ দেখা দেয় কেন!

● ঘাড়ে, পিঠে,কোমরে ব্যাথা কি অন্য প্রাণীর হয়! ড. সিলভারের মতে ব্যাক পেন হলো অন্যতম দীর্ঘকালস্থায়ী রোগ যাতে বেশিরভাগ মানুষ ভোগে। কারণ তারা পৃথিবীর অনান্য প্রাণীর মতো, হাঁটা চলা ও বিভিন্ন কাজে মাধ্যাকর্ষণের সাহায্য পায় না। এই রোগটিই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ, যেটা আমাদের বুঝিয়ে দেয় আমাদের দেহ অন্য কোনো গ্রহে বসবাসের উপযুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল যেখানে মাধ্যাকর্ষণ কম।

● মানুষেরা বাচ্চার মাথা বড় হওয়ার জন্য নারীদের স্বাভাবিক উপায়ে প্রসব করতে অসুবিধা হয়। অনেক মা ও শিশুর মৃত্যু পর্যন্ত হয়। কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোনও জীব প্রজাতির এরকম সমস্যাই নেই। মানুষের ইউটেরাসের ভেতর থাকা জায়গার তুলনায় শিশুর আয়তন অনেক বড় হয়। কারণ উঁচু পর্যায়ের পুষ্টি পায় বলে।

● মানুষের দেহে ২২৩টি অতিরিক্ত জিন থাকাও স্বাভাবিক নয়। কারণ পৃথিবীর অন্য প্রজাতির দেহে অতিরিক্ত জিন নেই।

● পৃথিবীর কোনো মানুষই ১০০% সুস্থ নয়। প্রত্যেকেই এক বা একাধিক রোগে ভোগে।

● মানুষের ঘুম নিয়ে গবেষণা করে গবেষকরা বলছেন পৃথিবীতে দিন ২৪ ঘণ্টার, কিন্তু আমাদের দেহের অভ্যন্তরীণ ঘড়ির মতে, আমাদের দিন হওয়া উচিত ছিল ২৫ ঘন্টার। এবং এটা কিন্তু আধুনিক যুগে সভ্যতার বিকাশ ও উল্কাগতির জন্য হয়নি। মানবজাতির সূত্রপাত থেকেই দেহঘড়িতে একটি দিনের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ২৫ ঘণ্টা।

● আমাদের ত্বকে ট্যান পড়া বা সূর্যরশ্মির প্রভাবে চামড়া কালো হওয়া সেটাই প্রমাণ করে সূর্য রশ্মি মানুষের পক্ষে উপযুক্ত নয়!

বিভিন্ন বিজ্ঞানী সিলভারের থিওরিটির সমালোচনা করেছেন ও তির্যক চোখে দেখেছেন। কিন্তু অনেকে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাই তুমুল বিতর্ক চলছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত মানবজাতির উৎপত্তি সম্পর্কে অবিতর্কিত উত্তর পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন বিজ্ঞনী বলেছেন, ড. সিলভার যে যুক্তিগুলো হাজির করেছেন, সেগুলি কিন্তু বাস্তব। সেটাও ফেলে দেওয়ার নয়। সত্যিই তো পৃথিবীর অনান্য প্রজাতির জীবের চেয়ে আমরাই কেন আলাদা হলাম। দেখা যাক বিজ্ঞান আগামী দিনে তাঁর প্রশ্নের কী উত্তর দেয়।

মহাকাশচারীরা কেন কমলা এবং সাদা রঙের স্যুট পরেন !

আবিরা আফরোজা মুনা

মহাকাশ মিশন এ সকল মহাকাশচারী ই বিশেষ স্যুট পরে থাকেন । এই বিশেষ স্যুট এর রং কেমন খেয়াল করেছেন কি ? মহাকাশ মিশন সম্পর্কিত প্রায় সকল মুভি কিংবা সিরিজেই আমরা মহাকাশচারীদের মধ্যে দুই ধরণের স্যুট পড়তে দেখি। কিন্তু মুভির মহাকাশচারীদের মত বাস্তবের মহাকাশচারীরাও কি দুই ধরণের স্যুট পরেন? সাদা রঙের একটা স্পেস স্যুট পড়তে তো আমরা বেশিরভাগ মহাকাশচারী কে ই দেখেছি । বাস্তবে বেশিরভগ সময় তারা দুই রং এর স্পেস সুট পরে থাকেন । একটি সাদা এবং অপরটি রং কমলা। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে দুই রকমের স্যুট পরার কারণ কি? এটা হয়ত আমরা খেয়াল করি নি! খুব সাধারণভাবে নিলেও এই দুই রকমের স্যুট পরার পেছনে যথেষ্ট কারণ আছে।

কমলা রঙের স্যুটটা মূলত নিরাপত্তার জন্য পরা হয়ে থাকে। স্পেস শাটল লঞ্চ এবং ল্যান্ডিংয়ের সময় মহাকাশচারীরা কমলা রঙের স্যুট পরেন। কমলা রঙের এই স্যুটটি Advanced Crew Escape Suit (ACES) নামে পরিচিত। সাদা রঙের স্যুট আমাদের সবচেয়ে পরিচিত স্যুট। চাঁদে নামার যে ভিডিওটি আমরা দেখেছি তাতে তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে স্যুটটি সাদা রঙের ছিল। মহাকাশচারীরা যখন স্পেস ষ্টেশন কিংবা কোনো স্পেসশিপ থেকে বাইরে বের হন জোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে Space Walk বলা হয় তখন সাদা রঙের স্যুটটি ব্যবহার করেন। সাদা রঙ তাপ প্রতিফলিত করায় বাইরে বের হওয়ার সময় মহাকাশচারীরা এটি ব্যবহার করেন যেন অতিরিক্ত তাপমাত্রায় কোনো অসুবিধা না হয়। সাদা রঙের স্যুটটি Extravehicular Activity Suit (EVA) নামেও পরিচিত। ACES ও EVA স্যুট দুইটি মহাকাশ জগতের সবচেয়ে পরিচিতি দুটি স্যুট যা আমরা সবাই কমবেশী দেখেছি। কিন্তু এই দুই রঙের স্যুট ছাড়াও আরো একটি স্যুট মহাকাশচারীরা ব্যবহার করেন যা নীল রঙের। খুব একটা ব্যবহার হয় না বলেই এই স্যুট আমাদের নজরে কম আসে। নীল রঙের এই স্পেসস্যুটটি বাকি দুটি স্পেসস্যুটের তুলনায় প্রায় ৪০ শতাংশ হালকা এবং আরো গতিশীল চাপ নিতে সক্ষম হয়।।

বাচ্চার মেধা কার থেকে আসে?

আবিরা আফরোজা মুনা

গবেষকদের মতে একজন মায়ের জেনেটিক্স নির্ধারণ করে যে তার সন্তানরা কতটা চালাক । তবে বাবা কোনো বিভিন্নতা তৈরি করে না ।মহিলাদের তাদের বাচ্চাদের কাছে বুদ্ধি জিনগুলি সঞ্চারিত করার সম্ভাবনা বেশি কারণ তারা বেশি এক্স ক্রোমোজোম বহন করে । মহিলাদের মধ্যে দুটি থাকে, পুরুষদের কেবল একটি থাকে।

তবে এগুলি ছাড়াও, বিজ্ঞানীরা এখন বিশ্বাস করেন যে উন্নত জ্ঞানীয় ফাংশনগুলির জন্য জিনগুলি বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয় যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিষ্ক্রিয় হতে পারে।

"কন্ডিশন জিন" নামে পরিচিত এক ধরণের জিনগুলি কেবলমাত্র কিছু ক্ষেত্রে মায়ের কাছ থেকে এলে কাজ করার কথা ভাবা যায় এবং অন্য ক্ষেত্রে পিতার কাছ থেকে এলে। "বুদ্ধি" মায়ের কাছ থেকে আসা কন্ডিশনাল জিন এর মধ্যে একটি বলে মনে করা হয়।

জেনেটিক্যালি মডিফাইড ইঁদুরগুলি ব্যবহার করে গবেষণায় দেখা গেছে যে মাতৃ জিনের অতিরিক্ত ডোজযুক্ত ব্যক্তিরা বড় মাথা এবং মস্তিষ্ক বিকাশ করেছে, তবে তাদের দেহ খুব ছোট ছিল। পিতৃতান্ত্রিক জিনগুলির অতিরিক্ত ডোজ সহ যাদের জন্ম তাদের ছোট মস্তিষ্ক এবং বৃহত্তর শরীর ছিল।

গবেষকরা মস্তিষ্কের ছয়টি পৃথক অংশ সনাক্ত করে যাতে মাতৃ বা পিতৃ জিন রয়েছে এবং যা খাওয়ার অভ্যাস থেকে স্মৃতিশক্তি পর্যন্ত বিভিন্ন জ্ঞানীয় ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে।

লিম্বিক সিস্টেমের অংশগুলিতে পিতৃতান্ত্রিক জিন সহ কোষগুলি লিঙ্গ, খাদ্য এবং আগ্রাসনের মতো ক্রিয়া জড়িত। তবে গবেষকরা সেরিব্রাল কর্টেক্সে কোনও পৈত্রিক কোষ খুঁজে পাননি, যেখানে যুক্তি, চিন্তাভাবনা, ভাষা এবং পরিকল্পনার মতো সর্বাধিক উন্নত জ্ঞানীয় কার্য হয়।

লোকেরা ইঁদুরের মতো নাও হতে পারে বলে গবেষকরা উদ্বিগ্ন। গ্লাসগোতে গবেষকরা বুদ্ধি অন্বেষণে আরও বেশি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। 1994 সাল থেকে প্রতিবছর 14 থেকে 22 বছর বয়সের 12,686 জন তরুণদের সাথে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় গবেষকরা ইঁদুর সমীক্ষায় প্রাপ্ত তত্ত্বগুলি বাস্তবে প্রকাশ পেয়েছেন ।যাইহোক, গবেষণা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে জেনেটিক্স কেবল বুদ্ধি নির্ধারণ করে না - বুদ্ধির মাত্র 40 থেকে 60 শতাংশ বংশানুক্রমিক হিসাবে অনুমান করা হয়। এটা পরিবেশের উপর একই রকম নির্ভরতা রেখে যায়।

তবে মায়ের বুদ্ধিমত্তার নন-জেনেটিক অংশও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে, কিছু গবেষণায় গবেষকরা মায়ের এবং সন্তানের মধ্যে একটি সুরক্ষিত বন্ধন নিবিড়ভাবে বুদ্ধিমত্তার সাথে জড়িত আছে বলে পরামর্শ দেন।

ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন যে মস্তিষ্কের কিছু অংশের বিকাশের জন্য মা এবং সন্তানের মধ্যে একটি সুরক্ষিত মানসিক বন্ধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।মায়ের সাথে একটি মজবুত বন্ধন একটি শিশুকে সুরক্ষার উপলব্ধি দেয়, যা তাদেরকে বিশ্বের অন্বেষণ করতে এবং সমস্যাগুলি সমাধান করার আত্মবিশ্বাস দেয়।

অবশ্যই, কোনও কারণ নেই যে পিতারা মায়ের মতো লালনপালনের ভূমিকা নিতে পারে না। এবং গবেষকরা দেখিয়েছেন যে অন্যান্য জিন নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যগুলির একটি সম্পূর্ণ বিন্যাস - যেমন ইনট্যুটোন এবং আবেগগুলি - যা পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হতে পারে এটি সম্ভাব্য বুদ্ধি আনলক করার মূল চাবিকাঠি, সুতরাং বাবার হতাশ হবার কারণ নেই ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: আমি কিন্তু কিছু বলি নাই, সব গবেষকদের বাণী)

তথ্য সূত্র:

১)https://www.independent.co.uk/news/science/children-intelligence-iq-mother-inherit-inheritance-genetics-genes-a7345596.html?fbclid=IwAR2sqzlCLBybY4F4Be82hPGFH7Ku0Y7Lkzf1SDr2rr2LZ6GLYakzcg2i_1k

Time And Reason Of Death

Zonathon Hasda

যার জন্ম আছে, তার মৃত্যুও আছে।" -চিরন্তন একটি সত্য কথা। একারণে সবার কাছেই শব্দটা জানা। আসলে মৃত্যু কি জিনিস আর এটা কিভাবে হয়ে থাকে। এরকম প্রশ্ন করাটা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। চলুন জেনে নেওয়া যাক মৃত্যু কি?

সাধারণভাবে মৃত্যু বলতে জীবনের সমাপ্তিকে বোঝায়। জীববিজ্ঞানের ভাষায় প্রান আছে এমন কোনো জৈব পদার্থের বা জীবের জীবনের সমাপ্তিকে মৃত্যু নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

আর মৃত্যু তখনই হয়ে থাকে যখন কোনো জীবের শারীরিক কর্মকাণ্ড যেমন শ্বসন, খাদ্য গ্রহণ, পরিচলন ইত্যাদি থেমে যায়। মৃত্যু বিভিন্ন স্তরে তথা বিভিন্ন ভাবে হয়ে থাকে। আর Somatic মৃত্যু হলো সামগ্রিক ভাবে কোনো জীবের মৃত্যু হওয়া। নির্দিষ্ট কোনো অঙ্গ, কোষ বা কোষাংশের মৃত্যুর আগেই এই Somatic মৃত্যু হয়ে থাকে। এতে হৃদস্পন্দন, শ্বসন, চলন, নড়াচড়া, প্রতিবর্ত ক্রীয়া এবং মস্তিষ্কের যাবতীয় কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। এই সোমাটিক মৃত্যু কখন ঘটে তা বলা অনেকটা জটিল। কেননা কোমা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, ঘোর বা ট্রান্সের মধ্যেই থাকা ব্যাক্তিও একই ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে থাকেন।

সোমাটিক মৃত্যুর পর অনেকগুলি পরিবর্তন ঘটে যার মাধ্যমে আমরা মৃত্যুর কারণ ও সময় নির্নয় করতে পারি। কিন্তু যখন কোনো জীবের মৃত্যু হয় তখন মারা যাওয়ার পর পরই পার্শ্ববর্তী পরিবেশের প্রভাবে মৃত দেহ ঠান্ডা হয়ে যায় , যাকে বলে Algor Mortis. মারা যাওয়ার ৫ থেকে ১০ ঘন্টার পরেই কঙ্কালের পেশিগুলো অনেকটা শক্ত হয়ে যায়। একে medical science -এ Rigor Mortis বলে অভিহিত করা হয় এবং এটি ৩ থেকে ৪ দিন পর শেষ হয়ে যায়। আবার লক্ষ্যনীয় যে, মৃত ব্যক্তির রেখে দেওয়া দেহেরর নিচের অংশে যে লাল - নীল রঙ দেখা যায় তাকে Livor Mortis বলে। সাধারণত রক্ত জমাট হয়ে থাকার কারণে এমনটি হয়ে থাকে। আর তারপরে দেহের যে পচন শুরু হয় তার জন্য দায়ী থাকে ব্যাকটেরিয়া ও কিছু এনজাইম। দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভিন্ন হারে মারা যায়। যেমন সোমাটিক মৃত্যুর ঠিক ৫ মিনিট পরেই মস্তিষ্কের কোষগুলির মৃত্যু ঘটে। যেখানে অন্যদিকে হৃদপিন্ডের কোষগুলি ১৫ মিনিট এবং বৃক্কের কোষগুলি প্রায় ৩০ মিনিট পর্যন্ত বেঁচে থাকে বা বেঁচে থাকতে পারে। আর এই কারনেই সদ্যমৃত ব্যক্তির কাছ থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সরিয়ে অন্য জীবিত ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করা হয়.

গণিতে দক্ষতা বৃদ্ধিতে বৈদ্যুতিক শক!

আবিরা আফরোজা মুনা

নতুন সমীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে যে মস্তিষ্কে প্রয়োগ করা একটি মৃদু, ব্যথাহীন বৈদ্যুতিক প্রবাহ 6 মাস পর্যন্ত গণিতের কার্যকারিতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। এটি কীভাবে কাজ করে তা গবেষকরা পুরোপুরি বুঝতে পারে নি এবং এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও হতে পারে।

মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তনের জন্য বৈদ্যুতিক কারেন্ট ব্যবহার করার ধারণাটি নতুন কিছু নয় — ইলেক্ট্রোশক থেরাপি, যা চিকিৎসা প্রয়োগের জন্য ব্যাবহার করা হতো । সম্ভবত এটি সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে মস্তিষ্কের লক্ষ্যবস্তু অঞ্চলে প্রয়োগ করা অনেক হালকা বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা স্ট্রোকের পরে চিহ্নিতকরণ থেকে বক্তৃতা পুনর্বাসন পর্যন্ত বিস্তৃত কাজগুলিতে শিখনকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

২০১০ সালে, যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির জ্ঞানীয় স্নায়ুবিজ্ঞানী রই কোহেন কাদোশ দেখিয়েছিলেন যে, প্রশিক্ষণের সাথে মিলিত হলে বৈদ্যুতিক মস্তিষ্কের উদ্দীপনা মানুষকে খুব মৌলিক সংখ্যাগত কাজগুলিতে আরও উন্নত করতে পারে , যেমন দুটি পরিমাণের মধ্যে কোনটি বড় তা বিচার করা। যাইহোক, এটি স্পষ্ট ছিল না যে এই মৌলিক সংখ্যাগত দক্ষতা কীভাবে বাস্তব-বিশ্বের গণিতের যোগ্যতায় অনুবাদ করবে।

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য, কোহেন কাদোশ 25 টি স্বেচ্ছাসেবীকে গণিতের অনুশীলনের জন্য নিয়োগ করেছিলেন যখন সত্যিকারের মস্তিষ্কের উদ্দীপনা পেয়েছিলেন। জঞ্জালিন থম্পসন বলেছেন, দুটি স্পঞ্জ-আচ্ছাদিত ইলেক্ট্রোড, যা স্ট্রেচি অ্যাথলেটিক ব্যান্ডের সাহায্যে কপালের দুপাশে স্থির থাকে, প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সের একটি অঞ্চলকে টার্গেট করে যে গাণিতিক প্রক্রিয়াজাতকরণের কী হিসাবে বিবেচিত হয়। কোহেন কাদোশের ল্যাবে শিক্ষার্থী এবং গবেষক বৈদ্যুতিক

প্রবাহটি ধীরে ধীরে প্রায় 1 মিলিঅ্যাম্প পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয় যাকিনা ব্যাটারির ভোল্টেজের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ । তারপরে এলোমেলোভাবে উচ্চ এবং নিম্ন মানের মধ্যে ওঠানামা করে। গবেষকরা সামান্য পরিমাণের বিদ্যুত বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাথমিক সংবেদনটি অনুকরণ করেছিলেন, তারপরে এটিকে বন্ধ করে দিয়েছেন।

5 দিনের মধ্যে প্রতিদিন 20 মিনিটের জন্য, অংশগ্রহণকারীরা স্বেচ্ছাসেবী গাণিতিক "তথ্যগুলি" মুখস্থ করে , তারপর মুখস্ত চিহ্নগুলির উপর ভিত্তি করে পাটিগণিতের একাধিক পদক্ষেপের জন্য আরও পরিশীলিত কাজ সম্পাদন করে। অংশগ্রহণকারীদের ব্রেইনগুলি কার্য সম্পাদন করার সময় কতটা দক্ষতার সাথে কাজ করছিল তা পরিমাপ করতে গবেষকরা কাছাকাছি-ইনফ্রারেড স্পেকট্রোস্কোপি নামে একটি মস্তিষ্কের ইমেজিং কৌশলও ব্যবহার করেছিল।ছয় মাস পরে, গবেষকরা অংশগ্রহণকারীদের ডেকে দেখেন যে মস্তিষ্কের উদ্দীপনা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা একই ধরণের গাণিতিক চ্যালেঞ্জগুলিতে এখনও প্রায় 30% দ্রুত ছিলেন। থম্পসন বলেছেন, লক্ষ্যযুক্ত মস্তিষ্কের অঞ্চল আরও কার্যকর কার্যকলাপ দেখিয়েছিল।

যদিও প্রযুক্তিটি কীভাবে কাজ করে তা পরিষ্কার নয়, থম্পসন বলেছেন, এই অনুমানটি বর্তমান নিউরন ফায়ারিংকে সিঙ্ক্রোনাইজ করতে সহায়তা করে, মস্তিষ্ককে আরও দক্ষতার সাথে কাজ করতে সক্ষম করে। নেতিবাচক বা অনিচ্ছাকৃত প্রভাবের ফলস্বরূপ ফলাফল হতে পারে কিনা তা বিজ্ঞানীরাও জানেন না। থম্পসন বলেছেন, মস্তিষ্কের উদ্দীপনার কোনও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায় নি, "কোনও নির্দিষ্টতার সাথে বলা অসম্ভব" ।

ভবিষ্যতে গবেষকরা এমন গ্রুপগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করবেন বলে আশা করছেন যা প্রায়শই গণিতের সাথে লড়াই করে, যেমন নিউরোডিজেনারেটিভ ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তি । জনসন বলেছে,যদি পরের পরীক্ষাটি দেখায় যে কৌশলটি নিরাপদ এবং কার্যকর, তবে স্কুলগুলিতে শিশুরা তাদের পাঠের পাশাপাশি মস্তিষ্কের উদ্দীপনাও অর্জন করতে পারবে।। তবে বিদ্যালয়গুলির জন্য পদ্ধতিটি প্রস্তুত হওয়ার আগে অনেক দীর্ঘ পথ যেতে হবে । তিনি বাসায় বৈদ্যুতিক এই রিসার্চ টি প্রয়েগে এর ব্যাপারে কঠোর ভাবেও সাবধান করেছে ।

সুতরাং বাসায় একদম ই চেষ্টা করবেন না! একদম ই না!

তথ্য সূত্র:

১)https://www.huffpost.com/entry/math-skills-electric-shock-brain_n_3291817?fbclid=IwAR0gLfCnkQhgipZI_4GA3zIb57mxrCfu6TtTjDFItCYdcZknIm9dRzgAM7Q

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় ইঁদুর ব্যাবহার করা হয় কেন?

আবিরা আফরোজা মুনা

বৈজ্ঞানিকভাবে মানুষের শারীরিক সমস্যা সমাধানের জন্য পরীক্ষার আশানুরূপ ফল পাওয়া পর্যন্ত সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করতে পারে এমন কোনো জীবন্ত প্রাণী কে পছন্দ করে মানুষ।রোডেন্ট বা ছোট ইঁদুর, বড় ইঁদুর এবং লিঙ্গ ভেদেও ইঁদুর ব্যবহারের প্রতিই গবেষকেরা বেশি আগ্রহী হয়ে থাকেন। ফাউন্ডেশন ফর বায়োমেডিকাল রিসার্চের অনুসন্ধান বলে, বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রায় ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রেই ইঁদুর ব্যবহার করা হয় । কিন্তু কেন পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য ইঁদুরকে পছন্দ করা হয়! চলুন জানা যাক।

১.ইঁদুর ছোট প্রাণী এদেরকে খুব সহজেই পরিচালনা ও পরিবহন করা যায় এবং পরীক্ষা চালিয়ে যেতে সাহায্য করে।

২. ইঁদুরের প্রজনন ক্ষমতা দুর্দান্ত।প্রাণীদের তুলনায় এরা খুব দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে পারে ।এরা খুব কম সময় বেঁচে থাকে।অর্থাৎ এরা নতুন প্রজন্মের জন্য স্থান ছেড়ে দেয়। এজন্য খুব কম সময়ের মধ্যে বিভিন্ন জেনারেশনে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়।

৩.মানুষের সাথে ইঁদুরের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের মিল পাওয়া যায় বলে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ইঁদুর ব্যবহার করা হয়। Koshland Science Museum এর মতে ইঁদুরের 90% জিন আশ্চর্যজনক ভাবে মানুষের সাথে মিলে যায়।এ কারণেই মানুষের বিভিন্ন প্রকার জিনের মিথস্ক্রিয়ার প্রকৃতি পরীক্ষার জন্য মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে ইঁদুর। এছাড়াও মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের সাথে ইঁদুরের অঙ্গের বা তন্ত্রের মিল পাওয়া যায়। এজন্যই মানুষের শরীরে বিভিন্ন প্রকার ওষুধের প্রভাব নির্ণয় করা যায়।

৪.আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে এরা জিনগতভাবে পরিবর্তিত হতে পারে এদের নির্দিষ্ট জিনকে বন্ধ করে বা খুলে রাখা যায় এবং এর ফলে কি পরিবর্তন হয় তা পর্যবেক্ষণ করা যায়। বিপরীত জিন সম্বলিত এই প্রকার ইঁদুরকে নক-আউট ইঁদুর বলা হয়। কিভাবে নির্দিষ্ট জিন নির্দিষ্ট রোগের জন্য দায়ী তা নির্ণয় এই প্রকার ইঁদুর ভীষণভাবে কাজে দেয়।আরেক ধরনের ইঁদুর আছে যাদের ট্রান্সজেনিক ইঁদুর বলা হয়।বাহির থেকে ডিএনএ এদের শরীরে প্রবেশ করানোর পরে প্রজনন করানো হয় ।মানুষের যন্ত্রণাদায়ক রোগের ম্যাপিং মডেল তৈরিতে সাহায্য করে এই ইঁদুর।

৫.অনেক ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য নিয়ে আসা প্রাণীদের সামলানো কষ্টকর হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে তারা হিংস্র হয়ে যায়। কখনো শারীরিকভাবে সাহায্য করে না। ইঁদুরের ক্ষেত্রে এমন কিছু ঘটে না। তারা খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণযোগ্য। গবেষণার কাজে তাদের ব্যবহার করতেও তাই সুবিধা হয়।

৬.অন্যান্য প্রাণীর চাইতে ইঁদুরের দাম অনেক কম। কারণ, একসঙ্গে অনেকগুলো ইঁদুর বেচার জন্য জন্ম দেওয়া হয়। সেখান থেকে কম খরচে বিক্রি করে দেওয়া হয়। এসব ক্ষেত্রে, ইঁদুর বিক্রির জন্য বাণিজ্যিকভাবে কাজ করে এমন অনেক প্রতিষ্ঠান চাইলেই খুঁজে বের করা সম্ভব। সরকারিভাবেও এদের লাইসেন্স নেওয়া থাকে বিধায় আইনি কোন সমস্যাও তৈরি হয় না।

Three States of Matter

Solid

- Particles in a solid are tightly packaged sually in a regular pattern.
and u
- Particles in a solid will vibrate but cannot move past each other.
- Solids retain their shapes.

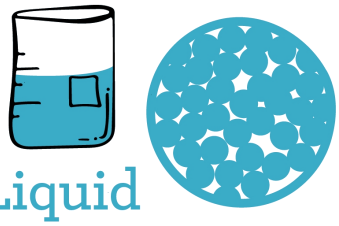

Liquid

- Particles in a liquid are close together with no regular pattern.
- Particles in a liquid flow and can easily move or slide past one another.
- Liquids assume the shape of their containers.

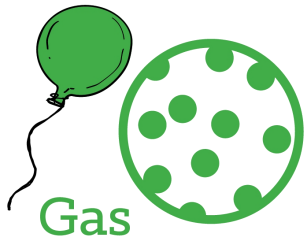

Gas

- Particles in a gas are well separated with no regular pattern.
- Particles in a gas vibrate freely at high speeds.
- Gasses assume the shapes of their containers.

পদার্থের তিন অবস্থা

মোঃ শাহরিয়ার আলম

স্বাভাবিকভাবে আমরা পদার্থের তিনটি অবস্থার কথা বলে থাকি!(প্লাজমা সর্বদা দৃশ্যমান নয় এবং খুব কম সময় সৃষ্টি হয়,যার জন্য আমরা পদার্থের তিনটি অবস্থাই বলি)! পদার্থের তিনটি অবস্থা হলো- ১. কঠিন, ২. তরল এবং ৩. গ্যাসীয়! অনেকেই ভাবছেন, ক্লাস থ্রি-তে যেই পড়াটি আছে তা আমি কেনো বলছি! আসলে পদার্থের অবস্থা সম্পর্কে বলতে চাচ্ছি না! কখনো কি একই সময়ে পদার্থের তিনটি অবস্থাই লক্ষ্য করেছেন?

খুব কম সংখ্যক জিনিস আছে যাদের ক্ষেত্রে আমরা পদার্থের তিনটি অবস্থাই একত্রে দেখতে পাই! তবে সেই কম সংখ্যকের মধ্যে একটি কমন পদার্থ হচ্ছে মোম;যেখানে আপনি একত্রে পদার্থের তিনটি অবস্থাই দেখতে পাবেন!

যখন মোমের দহন ঘটানো হবে, তখন প্রথমেই মোমের কঠিন অংশ গলতে থাকবে! অর্থাৎ,মোমের মধ্যে বিদ্যমান হাইড্রোকার্বন বাতাসের অক্সিজেনের দ্বারা দোহিত হবে!যার জন্য কঠিন মোম প্রথমে তরল হবে! এরপর এই তরল মোম এক পর্যায়ে মোমের স্ফুটনাংকের সমান তাপমাত্রা পেয়ে যাবে এবং এজন্য তরল মোম বাষ্পে পরিণত হতে থাকবে! আবার মোমের তরল অংশের কিছুটা কঠিনীভবন প্রক্রিয়ায় কঠিন মোমে পরিনত হয়! আর এভাবে আমরা মোমের মধ্যে পদার্থের তিনটি অবস্থাই পর্যায়ক্রমে দেখতে পাই!

আমরা পৃথিবী থেকে ছিটকে যাই না কেন?

মোঃ শাহরিয়ার আলম

আমরা পৃথিবী থেকে ছিটকে না যাওয়ার কারন হিসেবে প্রতিটি বস্তুকণার ভূমিকা রয়েছে।ঘোলাটে লাগছে?চলুন একটু ব্যাখ্যার দিকে যাই।

বিজ্ঞানী নিউটন তার সার্বজনীন মহাকর্ষ সূত্রে বলেছিলেনঃ মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষন করে এবং এ আকর্ষন বলের মান বস্তু কণাদ্বয়ের ভরের গুনফলের সমানুপাতিক এবং দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।

লক্ষ্য করুনঃ মহাকর্ষ সূত্রের আলোকে আপনি এ মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা কর্তৃক আকর্ষিত হচ্ছেন। হয়তো দূরত্বের পার্থক্যের কারনে বলের মান তথা আকর্ষনের মান কম বা বেশি হয়।অর্থাৎ দালানের প্রতিটি সিমেন্ট কিংবা বালুকণা,প্রত্যেক মানুষের কোষ,বাতাসের প্রত্যেকটও কণা আকর্ষম করছে আপনাকে।

পৃথিবী কেবল যদি আপনাকে আকর্ষন করতো তাহলে আপনি কুজো হয়ে যেতেন।কারন যেদিকে পৃথিবীর আকর্ষন কাজ করছে ঠিক সেদিকে-ই বায়ুস্তর প্রতি মিটার^২ এ ১০^৫ নিউটন চাপ প্রয়োগ করছে।কিন্তু আপনাকে বায়ুস্তরের প্রত্যেকটি কণা তাদের মহাকর্ষ ধর্মের জন্য আকর্ষন করছে বলে আপনি এ বায়ুস্তরের এ বিশাল চাপকে অনুভব করেন না।(যদিও এক্ষেত্রে রক্তচাপের-ও একটা বিষয় জড়িত তবে তা সকল প্রাণীর জন্য প্রযোজ্য নয়।কারন সকল প্রাণী উষ্ণ রক্তের প্রাণী না)।চাঁদ, সূর্য এমনকি এ সৌরজগতের প্রত্যেক গ্রহের আকর্ষন আছে বলেই আপনি বেঁচে আছেন।কারন পৃথিবীর অতি আকর্ষন আর অন্য মহাজাগতিক কণার আকর্ষন কিছুটা কাটাকাটি হয়ে যায়।যার ফলে আপনার উপর সামান্য বল কাজ করে এবং আপনি সামান্য চাপ অনুভব করে থাকেন।

তাই কেবল পৃথিবীর আকর্ষনকে নয়;মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুকনার প্রতি একবার সম্মান জানানো প্রয়োজন। (ব্যক্তিগত মতামত)

শেষ অঙ্ক কত?

মোঃ শাহরিয়ার আলম

2007^{2007} সংখ্যাটির সর্বশেষ অঙ্ক দুটি কত? প্রশ্নটি একজনকে করেছিলাম। কিন্তু সে প্রশ্নটি সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারেনি। তবে সে যতটুকু চেষ্টা করেছে ততটুকুকে আন্তরিক ধন্যবাদ।
প্রথমে ভেবেছিলাম প্রশ্নটি আপনাদেরকে সমাধান করতে বলবো।কিন্তু গত কয়েকদিনের পরিস্থিতি দেখে তা আর মন চাইলো না।তাই আর সে পথে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছে নেই।উত্তর টা আমিই বলবো।যদিও এতে আপনার ব্রেইন টেস্ট হবে না।কেবল মুখস্তের মতো হবে।আর ব্রেইন টেস্ট করতে চাইলে আগে নিজে একবার চেষ্টা করুন।তো,এবার আমরা সমাধানের দিকে অগ্রসর হই। প্রথমে আমাদের সংখ্যাটি আরেকবার দেখি।সংখ্যাটি হলো ২০০৭^২০০৭.ক্যলকুলেটরে করবেন? মান আসবে syntax error বা math error. তাইলে অন্য পথে এগোতে চাচ্ছি।আমরা সমাধান করবো technique ব্যবহার করে।তেমন কিছু করতে হবে না।ভালোভাবে একটু চিন্তা করতে পারলেই যথেষ্ট।
প্রথমে আমরা ২০০৭^১ থেকে শুরু করবো।এভাবে পাওয়ার ৩ অথবা ৪ পর্যন্ত নিবো।

২০০৭^১=২০০৭.শেষ অঙ্ক ০৭
২০০৭^২=৪০২৭০৪৯,শেষ অঙ্কদ্বয় ৪৯
২০০৭^৩=৮০৮৪২৯৪৩৪৩,শেষ অঙ্কত্রয় ৩৪৩

আর প্রয়োজন নেই। এখানেই আমাদের উত্তরের বীজ লুকিয়ে আছে। এবার আমরা একটু সংখ্যাটির শেষ অঙ্ক ৭ এর পাওয়ার এর বিষয়টি দেখি।

৭^১=৭,শেষ অঙ্ক ৭
৭^২=৪৯,শেষ অঙ্কদ্বয় ৪৯
৭^৩=৩৪৩,শেষ অঙ্কত্রয় ৩৪৩

একটা বিষয় লক্ষ্য করুন। ২০০৭ এর সূচক এর শেষ অঙ্কগুলো ৭ এর সূচক এর সাথে মিলে যাচ্ছে।তার মানে ২০০৭^২০০৭ এর শেষ অঙ্কদ্বয় যা হবে ৭^২০০৭ এর শেষ অঙ্কদ্বয়ও তা-ই হবে।এবার নিশ্চয়ই ক্যালকুলেটর নিয়েছেন ৭^২০০৭ এর মান বের করার জন্য।কোনো লাভ নেই।উত্তর আসবে math error. তাহলে বের করবো কিভাবে? সেদিকেই যাচ্ছি। আমরা একটু ৭ এর কয়েকটি সূচক লক্ষ্য করিঃ

$$7^1 = 7$$
$$7^2 = 49$$

$$7^3 = 343$$
$$7^4 = 2401$$
$$7^5 = 16807$$
$$7^6 = 117649$$
$$7^7 = 823543$$

আর প্রয়োজন নেই। যখন ৭ টর সূচক ছিলো ১ তখন সর্বশেষ অঙ্ক ছিলো ৭। আবার যখন পাওয়ায় বা সূচক ছিলো ৫ তখন আবার শেষ অঙ্ক হয়েছে ৭. একইভাবে যখন পাওয়ায় ছিলো ২ তখন সর্বশেষ অঙ্কদ্বয় ছিলো ৪৯, আবার যখন সূচকের মান ৬ তখন আবার সর্বশেষ অঙ্কদ্বয় ৪৯. কেমন জানি একটা প্যাটার্ন এর ঘ্রাণ আসছে নাকে।প্রতি ৪ সূচক পরপর শেষ অঙ্কগুলো একই।তাহলে সূচক যদি ২০০৭ হয় তবে ৭ এর সূচক ১ থেকে ৪ এর কোনটির সাথে মিলবে?এটি জানতে ক্লাস ফোর এর জ্ঞানই যথেষ্ট। যেহেতু প্রতি ৪ সূচক পরপর শেষ অঙ্কগুলো একই তাই ২০০৭ কে ৪ দিয়ে ভাগ করতে হবে।ভাগ করার পর যত ভাগশেষ থাকবে তাকে ৭ এর পাওয়ার হিসেবে নিলে শেষ অঙ্কগুলো যা হবে ২০০৭^২০০৭ এর শেষ অঙ্কগুলোও তা-ই হবে।২০০৭ কে ৪ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ হবে ৩. তারমানে ৭ এর পাওয়ার ৩ নিলে শেষ অঙ্কগুলো যা হবে তা-ই হবে আমাদের উত্তর।যদি ৭ এর পাওয়ার হয় ৩ তবে সর্বশেষ অঙ্কদ্বয় হবে ৪৩. হ্যাঁ,এটাই আমাদের এত সাধনার ফলাফল।

বিঃদ্রঃ Number Theory এর বিশেষ শাখা Modular Arithmetic ব্যবহার করে আরো সহজেই উত্তর বের করা যায়! কিন্তু সেটি সবার বোধগম্য হবে না!

নেমোফোবিয়া

মোঃ শাহরিয়ার আলম

মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, যখন কোনো মানুষ মোবাইল ফোনের প্রতি অতিরিক্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তখন তারা যে ধরনের মানসিক রোগীতে পরিনত হয়, সেই মানসিক রোগকে বলে নেমোফোবিয়া! যেকোনো বয়সের মানুষের মোবাইলের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ থাকার কারনে, ছোট থেকে বয়োবৃদ্ধ সকলেই নেমোফোবিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে!

যারা এই মানসিক রোগের শিকার,তাদের কিছু সাধারন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়!প্রথমত, এরা একবার মোবাইল নিলে তা খুব সহজে ছেড়ে যেতে চায় না!অনেকেই মোবাইলের সম্পূর্ণ কার্যক্ষমতা শেষ হওয়া পর্যন্ত তা হাতছাড়া করতে রাজি হন না।(অর্থাৎ,চার্জ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত!) এরা মানুষের সাথে খুব একটা মেলামেশা করে না!সারাক্ষণ মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকাতেই তাদের আনন্দ!বাহ্যিক পরিবেশের সৌন্দর্যের প্রতি কিংবা ঘুরাঘুরির প্রতি এদের কোনো আকর্ষণ থাকে না!

উপরের এসকল বৈশিষ্ট্যের কারনে স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ তাদেরকে নিয়ে নানা ব্যঙ্গতার সৃষ্টি করে!কিন্তু আসলে এটিকে তাদের নিজেদের দোষ বলাটা অন্যায় হবে!কেননা,এটি নিয়ন্ত্রণের কোনো উপায় তাদের কাছে থাকে না!মোবাইল ব্যাবহার করতে করতে তাদের মস্তিষ্কে "ডোপামিন" নিঃসরন এর পরিমান অত্যান্ত বেড়ে যায়! যার জন্য এরা মোবাইলের প্রতি মারাত্মকভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে!

মানসিক চাপে চুল কেন পাকে?

আবিরা আফরোজা মুনা

মানসিক চাপে চুল পাকা! বড়ই সমস্যা! কিন্তু কেন মানসিক চাপে পাকে চুল? সে রহস্যের সমাধান বিজ্ঞানীরা বের করতে সমর্থ হয়েছেন বলে তারা জানিয়েছেন।

ইঁদুরের ওপর চালানো এক পরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, যেসব স্টেম সেল গায়ের এবং চুলের রং নিয়ন্ত্রণ করে তীব্র ব্যথা থেকে উদ্ভূত চাপে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এইভাবে দেখা গেছে, মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে গাঢ় রঙ এর ইঁদুরের গায়ের সমস্ত লোম পেকে সাদা হয়ে গেছে।

ব্রাজিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এই গবেষণার ফল ধরে সামনের দিনে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চুলের রঙ বদলে যাওয়া ঠেকানোর ওষুধ আবিষ্কার সহজ হতে পারে। ত্রিশ বছরের পর নারী পুরুষ যে কারেই চুল সাদা হতে শুরু করতে পারে, যদিও স্বাভাবিকভাবে বয়স বাড়ার লক্ষণ হিসেবে চুলের রং পরিবর্তন হয়। তার সঙ্গে জিনের মানে বংশের লোকের চুল পাকার ধরণ ও সময়ের একটা সম্পর্ক থাকে।

তবে, মানসিক চাপে যে চুল পেকে সাদা হয়ে যায়, এ কথা বহুকাল ধরেই প্রচলিত আছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এতদিন জানতেন না, ঠিক কীভাবে সেটা হয়।

সাও পাওলো ইউনিভার্সিটি এবং হার্ভাড ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে মেলানোসাইট স্টেম সেল সম্পর্কিত, যেটি মেলানিন উৎপাদন করে। মেলানিনের মাত্রার হেরফেরের কারণে চুল ও গায়ের রঙ এর ফারাক হয় মানুষের।

নেচার সাময়িকীতে প্রকাশিত গবেষণায় হার্ভাডের বিজ্ঞানী অধ্যা ইয়া-সিয়ে সু জানিয়েছেন, আমরা এখন নিশ্চিত যে মানসিক চাপের কারণে মানুষের চুল অকালে পেকে যেতে পারে এবং সেটা কীভাবে হয়, এখন আমরা তা জানি।

গবেষকেরা বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার জন্য ইঁদুরের শরীরে তীব্র যন্ত্রণা সৃষ্টির মাধ্যমে এই পরীক্ষা চালিয়েছেন। তাতে দেখা গেছে, অ্যাড্রেনালিন এবং কর্টিসল নিঃসরণ হয়, হৃদপিণ্ডের গতি ও রক্তের চাপ বেড়ে যায়, এবং তাদের নার্ভাস সিস্টেমে মারাত্মক প্রভাব ফেলে এবং চূড়ান্তভাবে এর ফলে ইঁদুরের মধ্যে ব্যাপক চাপ তৈরি হয়।ক্রমে এই প্রক্রিয়ার গতি বাড়িয়ে দেয়া হয় এবং দেখা যায় চুলের ফলিকলে থাকা মেলানিনে আঘাত করতে শুরু করে এই প্রক্রিয়া।

"আমি ধারণা করেছিলাম স্ট্রেস বা মানসিক চাপ শরীরের জন্য ক্ষতিকর, কিন্তু আমাদের ফলাফলে আমরা যা দেখেছি তা কল্পনারও বাইরে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে পিগমেন্ট-পুনঃরুৎপাদনকারী স্টেম সেলগুলো সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। এবং এর পর আর আপনার পিগমেন্ট তৈরি হবে না। ফলে ক্ষতিটা স্থায়ী।"

আরেক পরীক্ষায় গবেষকেরা দেখেছেন, কিছু ইঁদুরের লোমের রং পরিবর্তন থামিয়ে দেয়া হয়েছিল, তাদেরকে অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভ দেবার মাধ্যমে যা তাদের উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল এবং শারীরিক যন্ত্রণায় থাকা ইঁদুরের সঙ্গে এই চাপমুক্ত ইঁদুরের অবস্থা তুলনা করতে গিয়ে দেখা যায় তাদের স্টেম সেল ক্ষতিগ্রস্ত হবার পেছনে এক ধরণের প্রোটিন দায়ী।সাইক্লিন-ডিপেন্ডেন্ট কিনাস সিডিকে নামে এই প্রোটিনকে যখন দমন করা হয়, তখন ইঁদুরের লোমের রং বদল থেমে যায়। আর এর মাধ্যমেই বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন কিভাবে চুলের রং পরিবর্তন ঠেকানো যাবে, অর্থাৎ ওষুধ তৈরির সময় এই সিডিকে নামে এই প্রোটিনকে নিয়ন্ত্রণের কথা মাথায় রেখেই সেটা করতে হবে।

আর একে চুল পাকা ঠেকানোর পথ পেয়ে যাওয়া ভাবছেন না অধ্যাপক সু। তিনি বলছেন, "এটি মানুষের ওপর পরীক্ষা করা শুরুর প্রক্রিয়া আরম্ভ করবে মাত্র। সেই সঙ্গে শরীরের অন্যান্য অংশের চুলও কেন পাকে সেটাও বুঝতে পারছি আমরা।"

মানসিক চাপে মানুষের চুল কেন সাদা হয়ে যায়, তার প্রতিকার কী কিংবা কীভাবে ঠেকানো যাবে চুল পেকে যাওয়া, সম্ভবত সে রহস্যের সমাধান বিজ্ঞানীরা করতে সমর্থ হয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

ইঁদুরের ওপর চালানো এক পরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, যেসব স্টেম সেল গায়ের এবং চুলের রং নিয়ন্ত্রণ করে তীব্র ব্যথা থেকে উদ্ভূত চাপে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।এইভাবে দেখা গেছে, মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে গাঢ় রঙ এর ইঁদুরের গায়ের সমস্ত লোম পেকে সাদা হয়ে গেছে।

ব্রাজিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এই গবেষণার ফল ধরে সামনের দিনে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চুলের রঙ বদলে যাওয়া ঠেকানোর ওষুধ আবিষ্কার সহজ হতে পারে। ত্রিশ বছরের পর নারী পুরুষ যে কারেই চুল সাদা হতে শুরু করতে পারে, যদিও স্বাভাবিকভাবে বয়স বাড়ার লক্ষণ হিসেবে চুলের রং পরিবর্তন হয়। তার সঙ্গে জিনের মানে বংশের লোকের চুল পাকার ধরণ ও সময়ের একটা সম্পর্ক থাকে।

তবে, মানসিক চাপে যে চুল পেকে সাদা হয়ে যায়, এ কথা বহুকাল ধরেই প্রচলিত আছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এতদিন জানতেন না, ঠিক কীভাবে সেটা হয়।

সাও পাওলো ইউনিভার্সিটি এবং হার্ভাড ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে মেলানোসাইট স্টেম সেল সম্পর্কিত, যেটি মেলানিন উৎপাদন করে। মেলানিনের মাত্রার হেরফেরের কারণে চুল ও গায়ের রঙ এর ফারাক হয় মানুষের।

নেচার সাময়িকীতে প্রকাশিত গবেষণায় হার্ভাডের বিজ্ঞানী অধ্যা ইয়া-সিয়ে সু জানিয়েছেন, আমরা এখন নিশ্চিত যে মানসিক চাপের কারণে মানুষের চুল অকালে পেকে যেতে পারে এবং সেটা কীভাবে হয়, এখন আমরা তা জানি।

ইঁদুর বিড়ালের খুনসুটি!

আবিরা আফরোজা মুনা

ইঁদুর বিড়াল! ইঁদুরের ওপর বিড়ালের এ আধিপত্যের সাথে আমরা সুপরিচিত। কিন্তু কেন? এর পেছনে কি সাইন্স আছে ? হ্যাঁ, আছে, চলুন জানি রহস্যটা কী!

রুশ বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক এক গবেষণায় বলা হচ্ছে— ইঁদুরদের বিরুদ্ধে বিড়ালরা রীতিমতো 'রাসায়নিক অস্ত্র' প্রয়োগ করে থাকে। বিড়ালের মূত্রে থাকা বিশেষ রাসায়নিকই ইঁদুরকে বশে রাখার হাতিয়ার।

গবেষকেরা বলছেন, খুব ছোট্ট বেলায় যে ইঁদুরছানারা বিড়ালের মূত্রের সংস্পর্শে আসে বড় হয়েও তাদের বিড়ালের গায়ের গন্ধ এড়িয়ে চলার সম্ভাবনা কম। বিড়ালের মূত্রে থাকা বিশেষ রাসায়নিকের উপস্থিতিই ইঁদুরদের এই প্রতিক্রিয়ার কারণ। এই অস্ত্র প্রয়োগ করেই ইঁদুরদের বশ করে বিড়ালরা। সম্প্রতি চেক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী প্রাগে সোসাইটি ফর এক্সপেরিমেন্টাল বায়োলজির বার্ষিক সম্মেলনে এই গবেষণা উত্থাপন করা হয়েছে।

মস্কোর 'এএন সেভেরতভ ইনস্টিটিউট অফ ইকোলজি অ্যান্ড ইভোলিউশন'-এর বিজ্ঞানীরা আগের এক গবেষণায় দেখতে পেয়েছিলেন যে, বিড়ালের মূত্রে থাকা 'ফেলিনাইন' নামের রাসায়নিকের গন্ধে গর্ভবতী ইঁদুরের গর্ভপাত হয়ে যেতে পারে।

ড. ভেরা ভজনেসেনস্কায়া বলেন, বিড়াল-মূত্রে থাকা এই বিশেষ রাসায়নিকের প্রতি ইঁদুরের একটা শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া আছে। ইঁদুরের মস্তিষ্কে থাকা রাসায়নিক শনাক্তকরণের নিউরন বিড়ালের এই রাসায়নিকের গন্ধ চিনে নেয়। এর ফলে ইঁদুরের শরীরে মানসিক চাপের বিশেষ একটা হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়। ভজনেসেনস্কায়া বলেন,'ইঁদুর আর বিড়ালের মধ্যে হাজার হাজার বছর ধরেই এই বিশেষ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক বিদ্যমান।'

নতুন এ গবেষণায় বলা হয়েছে, বেড়ে ওঠার একটা 'জটিল পর্যায়ে' ইঁদুরছানারা বিড়াল-মূত্রের এই রাসায়নিকের সংস্পর্শে এলে বড় হয়ে তারা চিরশত্রু বিড়ালের গন্ধের বিষয়ে খুবই ভিন্নরকম আচরণ করবে। এই রাসায়নিকে ইঁদুরের 'মানসিক চাপ' বাড়ে কিন্তু 'আচরণ' পাল্টায় না। এই ইঁদুরছানারা বিড়ালের গন্ধ পেলেও পালাতে চাইবে না, বিড়ালের আশপাশেই থাকবে।

ভজনেসেনস্কায়া বলেন, 'এভাবে বসবাস করাটাই হয়তো ইঁদুরের জন্য সুবিধাজনক, ওরা পালিয়ে যেতে পারে না, কারণ খাদ্যের প্রয়োজনেই তাদের মানুষের আশপাশে থাকতে হয় আর বিড়ালও মানুষের আশপাশেই থাকে।' এই গবেষক আরও জানান, সম্ভবত এই রাসায়নিক প্রয়োগ করেই বিড়ালেরা তাদের আশপাশে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় ইঁদুরের উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

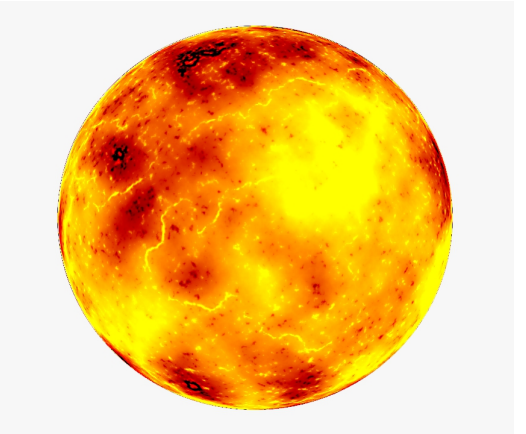

সূর্য

Rhr Rony

The sun- সূর্য। সূর্য হলো ছায়াপথের একটি জ্যোতিস্ক। আধুনিক গণনা অনুযায়ি ছায়াপথের কেন্দ্র হতে সূর্যের দূরত্ব আনুমানিক ৩২,০০০ আলোক বর্ষ। সুর্য ও তার প্রতিবেশি জ্যোতিস্ক মন্ডলি গড়ে প্রতি সেকেন্ডে ২৫০ কি.মি. গতিবেগে প্রায় বৃত্তীয় পথে ছায়াপথের কেন্দ্রকে প্রদক্ষিন করতে সুর্যের সময় লাগে প্রায় ২৫ কোটি বছর। এই সময় কালটিকে বলা হয় 'এক কসমিক বছর'। অন্যান্য জ্যোতিস্কের মতো সূর্যেরও মূল উপাদান হল হাইড্রজেন। এটির শক্তির উৎস পারমাণবিক বিস্ফোরণ বা নিউক্লিয়ার কলিশন। গণনায় প্রকাশিত হয়েছে, প্রতি সেকেন্ডে সূর্য প্রায় ১০ হাজার কোটি পাউন্ড হাইড্রজেন ধ্বংস করে। এভাবে চলতে থাকলে সূর্য তার হাইড্রজেনের ফুরিয়ে ফেলবে ৫০০ কোটি বছরের মধ্যে, আর সে পরিণত হবে লাল- দৈত্যে। পৃথিবী থেকে আমরা সূর্যের উজ্জ্বল পৃস্টতল দেখতে পাই। সূর্যের এই অঞ্চলটি ফটোস্ফিয়ার নামে পরিচিত। এর উপরে রয়েছে ক্রমোস্ফিয়ার। এরকম নামকরণ হয়েছে সূর্যের লালচে রঙের জন্য। তারপর আছে অপূর্ব করোনা। আমরা সূর্যগ্রহনের সময় এই করোনাকে দেখতে পাই। ক্রমোস্ফিয়ার ও করোনার মধ্যে স্প্যাকট্রোস্কোপিক পরীক্ষার ফলে একটি পরিষ্কার অত্যন্ত সরু সীমারেখা ধরা পড়ে। একে বলা হয় ট্রানজিশন অঞ্চল। ফটোস্ফিয়ার এর উষ্ণতা প্রায় ৬,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ক্রমোস্ফিয়ার এর উষ্ণতা প্রায় ৩২,৪০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ট্রানজিশন অঞ্চলের উষ্ণতা প্রায় ৩,২৪,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। করোনার উষ্ণতা প্রায় ২৭,০০,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, এর এত গরম যে এক্সরে বিকিরণে সমর্থ।

সূর্যের কেন্দ্রে যেখানে পারমাণবিক থার্মোনিউক্লিয়ার বিক্রিয়া ঘটে সেখানে উষ্ণতা ১.৫ ডিগ্রি কেলভিন। কেন্দ্রের ঘনত্ব পানির ঘনত্বের তুলনায় আনুমানিক ১০০ গুন বেশি। কেন্দ্রের বাইরে আছে কনভেকশন অঞ্চল। কেটলিতে টগবগ করে পানি ফুটলে যেমন হয় এখানে তেমনিভাবেই গ্যাসগুলির বিশৃঙ্খল গতি কেন্দ্রে উধভূত শক্তিকে ফটোস্ফিয়ারএ পাঠাতে সাহায্য করে। করোনার দৃশ্যমান সাদা আলো তৈরি হয়েছে সাতটি রঙ দিয়ে- বেগুনি, গাঢ় নীল, নীল, আকাশি সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। এই সাত রঙের সমাহারে উপর মিশে আছে শত শত গাঢ় রেখা। যাদের বলা হয় ফ্রনহার লাইন্স। প্রতিটি রেখা নির্দেশ করে সৌরআবহমন্ডলে কোনো না কোনো উপাদানের উপস্থিতি। আর রেখার ঘনত্ব ও প্রস্থ থেকে বোঝা যায় সেই উপাদানটির উষ্ণতা ও ঘনত্ব। সুর্য ক্রমাগত প্রোটনরুপে নিজের উপাদান চতুর্দিকে বিকিরণ করে চলেছে (মূলত হাইড্রজেন)।

বিষাক্ত ব্যাঙের বিস্তার ঠেকিয়ে দিচ্ছে ইঁদুর !

আবিরা আফরোজা মুনা

ব্যাঙ পোকামাকড় খেয়ে আমাদের অনেক উপকার করে এ কথা তো আমরা জানি । কিন্তু ব্যাঙ এত পোকামাকড় খেয়ে আমাদের উপকার যেমন করে, তেমনি অপকার ও করে । বিষাক্ত ব্যাঙের কারণে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে নানা প্রজাতির কিট পতঙ্গ । পরিবেশে ব্যালান্স তো থাকছে না । বিজ্ঞানীরা বিষাক্ত ব্যাঙের বিস্তার ঠেকাতে না পারলেও এক প্রজাতির ইঁদুর সেখানে আসার আলো জ্বালিয়েছে !বিষাক্ত ব্যাঙের হামলা এড়িয়ে সেগুলোকে খেতে শিখেছে অস্ট্রেলিয়ার পানির ইঁদুর।
এক প্রকার মারাত্মক ও বিষাক্ত আক্রমণাত্মক ব্যাঙ, যেটি ব্যাপক ক্ষতির কারণ হচ্ছিল, সেটির বিস্তার ঠেকিয়ে দিয়েছে ইঁদুরগুলো।'রাকালি' নামের ইঁদুর প্রজাতির এই প্রাণীটি যে প্রক্রিয়ায় তা করেছে, তা অবাক করার মতো।বিষে আক্রান্ত হওয়া এড়াতে, ব্যাঙগুলোর শরীরের হৃদপিণ্ড এবং যকৃৎ আলাদা করে ফেলে খাবারের ভোজ করেছে ইঁদুরগুলো। উভচর ওই ব্যাঙটির ওই অংশগুলো বিষাক্ত নয়।ইঁদুরের এই ''নিখুঁত অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ'' কৌশলের ব্যাপারটি মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটির একটি গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে।
বিজ্ঞানীরা বলছেন, রাকালি ইঁদুর হচ্ছে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র প্রাণী যে, নিজের ক্ষতি এড়িয়ে বিষাক্ত ক্যান টোড প্রজাতির ব্যাঙগুলোকে হত্যা করতে পারে।
অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম ক্যান টোড ব্যাঙ আনা হয় ১৯৩৫ সালে, যার উদ্দেশ্য ছিল উত্তরপূর্ব উপকূলের জমিতে আখে হামলা করা গুবরে পোকাগুলোকে দমন করা। এই ব্যাঙ সেগুলোকে খেয়ে ফেলবে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

এই উভচর প্রাণীটি যে কোনো পরিবেশে সহজে মানিয়ে নিতে পারে বলে পরিচিতি রয়েছে। এগুলো ব্যাপকভাবে বংশবৃদ্ধি করতে পারে এবং বছরে ষাট কিলোমিটার দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে পারে।এভাবেই সেগুলো ২০১১ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার কিমবার্লে অঞ্চলে চলে আসে। এরপর থেকে এসব ব্যাঙ ওই এলাকায় বেশ কিছু শিকারি প্রাণীর ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠেছে।

কুমির, কোয়ালা (ছোট ধরণের প্রাণী যেগুলোর পেটে থলি থাকে) এবং লিজার্ড বা টিকটিকি ঐ এলাকা থেকে বিলুপ্ত হতে বসেছে, কারণ এরা সবাই ওই ব্যাঙ খেয়েছিল।

এসব ব্যাঙের কানের কাছাকাছি একটি গ্রন্থিতে বিষ থাকে- যার সামান্য একটুও অনেক বুনো বা গৃহপালিত প্রাণীর জন্য মৃত্যুর কারণ হতে পারে।এ থেকে বাঁচতে বিজ্ঞানীরা এর আগে শিকারি প্রাণীগুলোকে খুব ক্ষুদ্র আকারের এই ব্যাঙ খাওয়াতেন। এর ফলে প্রাণীগুলোর পাকস্থলীতে গিয়ে সেগুলো অসুস্থ হয়ে পড়তো।এভাবে এ জাতীয় ব্যাঙ না খেতে প্রাণীগুলোকে শেখাতেন বিজ্ঞানীরা।

কিন্তু শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার আরেকটি নতুন উপায় দেখিয়ে দিলো রাকালি ইঁদুরগুলো।"২০১৪ সালে আমরা দেখতে পাই, শরীরে ফোঁটা দাগযুক্ত ব্যাঙগুলোর ওপর ঘনঘন হামলা করা হচ্ছে," বলছেন ওই ইঁদুরের আচরণ নিয়ে গবেষণাকারী জীববিজ্ঞানী মারিসা প্যারোট।"প্রতিদিন সকালে আমরা অন্তত পাঁচটি মৃত ব্যাঙ দেখতে পাই, যাদের পেটে ক্ষুদ্র আকারের কিন্তু সনাক্ত করার মতো ব্যবচ্ছেদের চিহ্ন রয়েছে। কিন্তু এ ধরণের প্রাণীর শরীরে এরকম ব্যবচ্ছেদ কে করছে?"

এরপর এই বিজ্ঞানীরা অনেকটা গোয়েন্দা বনে যান। তারা রিমোট ক্যামেরা স্থাপন করেন এবং ব্যাঙের শরীরে থাকা কামড়ের চিহ্ন বিশ্লেষণ করতে শুরু করেন। এরপরেই তারা বুঝতে পারেন, এ জন্য দায়ী হচ্ছে ইঁদুর।প্যারোট ব্যাখ্যা করেন, ময়না তদন্তের বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে ব্যাঙের আকার অনুযায়ী শরীরে ব্যবচ্ছেদের চিহ্নটি রয়েছে।"মাঝারি আকারের একটি ব্যাঙের ক্ষেত্রে, হৃদপিণ্ড এবং যকৃৎ আলাদা করার পাশাপাশি, পেছনের একটি বা দুইটি পা তাদের বিষাক্ত চামড়া থেকে আলাদা করে ফেলা হয়েছে এবং পেশিও খেয়ে ফেলা হয়েছে।"

সাপ, পাখি এমনকী কাকের মতো কিছু প্রজাতি এই বিষাক্ত ব্যাঙ খেয়ে থাকে, কিন্তু সেখানে এমন কোন উদাহরণ নেই যে, কোন স্তন্যপায়ী প্রাণী এসব ব্যাঙ শিকার করে খেয়ে ছেড়ে দিয়েছে।"কিছু ইঁদুর হয়তো ছোট আকারের ব্যাঙ খেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু ইঁদুরগুলো বিশেষভাবে বড় ব্যাঙগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করেছে, এরকম তথ্য আগে পাওয়া যায়নি।"অস্ট্রেলিয়া তে এখন দেড়শ কোটি ক্যান টোড রয়েছে বলে ধারণা করেন বিজ্ঞানীরা।

"আমাদের ক্ষেত্রে পানির ইঁদুর বড় ব্যাঙ খেতে পছন্দ করছে- আমরা যেসব মৃত ব্যাঙ পেয়েছি, তার চারভাগের তিনভাগই বড় আকারের। যদিও মধ্য এবং ছোট আকারের ব্যাঙের তুলনায় এগুলোর সংখ্যা কম।" গবেষণাপত্রে লিখেছেন প্যারোট।গবেষকরা বলছেন, এটা এখনো পরিষ্কার নয় যে ইঁদুরগুলো এসব ব্যাঙের ওপর হামলা করে নিরাপদে খেয়ে ফেলার কায়দা শিখে ফেলেছে কিনা। অথবা এসব ইঁদুর কি বিষাক্ত ব্যাঙ খাওয়ার জন্য এই কৌশল রপ্ত করে নিচ্ছে কিনা।

১৯৩৫ সালে আখ ক্ষেতে গুবরে পোকা দমন করার জন্য মাত্র ১০১টি ব্যাঙ ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।সেখান থেকে এসব ব্যাঙ এখন অস্ট্রেলিয়ার এমন অংশে এসে পৌঁছেছে, যা তাদের প্রথম আবাসস্থল থেকে ২০০০ কিলোমিটার দূরে। এই বিষাক্ত ব্যাঙ গুলোর বিস্তার ঠেকাতে ইঁদুর আসলেই খুবই গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে । থ্যাংক ইউ ইঁদুর আমাদের এত উপকার করার জন্য।

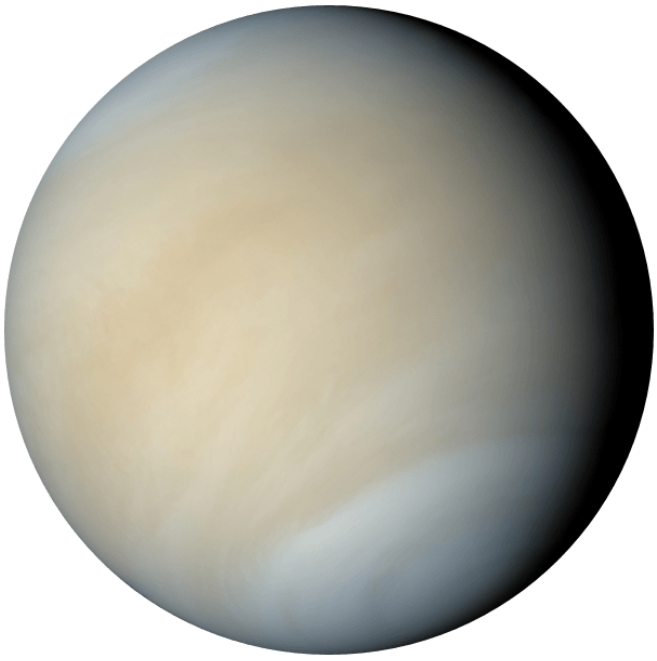

ব্যতিক্রমী এক গ্রহ

Mohammad Arafat Hossain Sami

নাহ খুব দূরে নয়, এক্কেবারে পৃথিবীর খুব কাছের একটা গ্রহ, শুক্র। আয়তনে আর ভরে পৃথিবীর সাথে বেশ মিল থাকায় কেউ কেউ একে পৃথিবীর বোনও বলে থাকেন। তবে পৃথিবীর সাথে মিল থাকলেও দুটো অভ্যাসের কারনে সৌরজগতের অন্য গ্রহদের তুলনায় একটু ব্যাতিক্রম।

এক দিন বড় নাকি এক বছর বড়?

এধরনের প্রশ্ন কাউকে করলে হয়তো পাগল ভাববে, কিন্ত শুক্র গ্রহের বেলা এটা ব্যতিক্রম। অর্থাৎ শুক্র গ্রহের এক দিন, শুক্র গ্রহের এক বছরের তুলনায় বড়!! ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি। কোন গ্রহের এক দিন মানে ওই গ্রহ নিজ অক্ষের উপর একবার আবর্তিত হওয়ার সময় আর বছর মানে হলো সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে যে সময় লাগে। সোজা কথায় বলতে গেলে শুক্র গ্রহের আহ্নিক গতি এতোটাই ধীর যে বছর পেরিয়ে যায় তবু দিনের শেষ হয় না। পৃথিবীর দিনের হিসেবে শুক্র গ্রহ সূহকে একবার প্রদক্ষিণ করতে ২২৫ দিন সময় লাগে কিন্তু নিজ অক্ষে একবার আবর্তিত হতেই লাগে ২৪৩ দিন!!

পশ্চিমে কি কখনো সূর্য উঠে?

হ্যাঁ পশ্চিমেও সূর্য উঠে, শুক্র গ্রহে। আমরা জানি পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তন করে। তাই আমরা পূর্ব দিকে সূর্য উঠতে দেখি। কিন্তু শুক্র গ্রহে ঠিক তার উল্টোটা ঘটে। অবশ্য এই অভ্যাস শুধু শুক্রেরই নয়, ইউরেনাসেরও একই অভ্যাস রয়েছে।

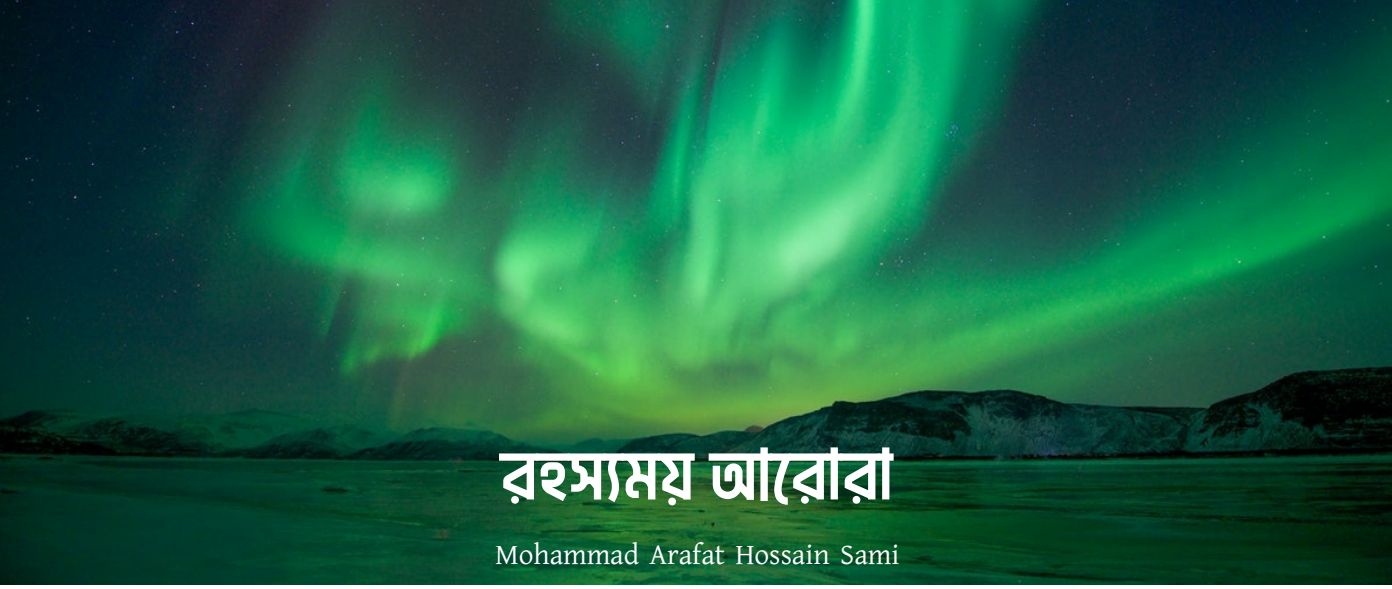

রহস্যময় আরোরা

Mohammad Arafat Hossain Sami

আরোরা বা মেরুজ্যোতি হলো আকাশে একধরনের প্রাকৃতিক আলোর প্রদর্শনী। যা চিরকাল মানুষের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে গেছে।প্রধানত উঁচু অক্ষাংশের এলাকাগুলোতে আরোরা'র দেখা মিলে। আরোরা নিয়ে প্রাচীনকালে অনেক উপকথা চালু ছিল।

আরোরা সৃষ্টির কারণ

সূর্য আমাদের থেকে প্রায় ৯৩ মিলিয়ন মাইল বা ১৪৯৫৯৭৮৭০৭০০ মিটার(প্রায় ১৫০ মিলিয়ন কি.মি.) দূরে অবস্থিত। কিন্তু এর প্রভাব বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সৌরঝড়ে চার্জিত কণা (প্লাজমা) মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীতে এসব কণা পৌছালে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র এবং বায়ুমন্ডল এর সাথে প্রতিক্রিয়া করে। যখন সূর্যের চার্জিত কণাগুলো আমাদের পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের অণু-পরমাণুকে আঘাত করে তখন সেই চার্জিত কণাগুলো বায়ুমন্ডলের অণু-পরমাণুগুলোকে আন্দোলিত করে এবং উজ্জ্বল করে তোলে। পরমাণু আন্দোলিত হওয়ার অর্থ হল এই যে, যেহেতু পরমাণু নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াসকে আবর্তনকৃত ইলেক্ট্রন দ্বারা গঠিত তাই যখন সূর্য থেকে আগত চার্জিত কণা বায়ুমন্ডলের পরমাণুকে আঘাত করে তখন ইলেক্ট্রনগুলো উচ্চ শক্তিস্তরে (নিউক্লিয়াস থেকে আপেক্ষিকভাবে অনেকদূরে) ঘুরতে শুরু করে। তারপর যখন আবার কোনো ইলেক্ট্রন নিম্ন শক্তিস্তরে চলে আসে তখন সেটি ফোটন বা আলোতে পরিণত হয়।
আরোরাতে যা ঘটে তেমনটি ঘটে নিয়নের বাতিতেও। নিয়ন টিউবের মধ্যে নিয়ন গ্যাসের পরমাণুগুলোকে আন্দোলিত করবার জন্য ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎ। তাই নিয়নের বাতিগুলো এরকম উচ্চ মানের রঙ্গিন আলো দেয়। আরোরাও ঠিক এভাবে কাজ করে-তবে এটি আরো বড় মাত্রায় হয়। আরোরাগুলো মাঝে মাঝে আলোর পর্দার মতো দেখায়। তবে এরা গোলাকার অথবা সর্পিল বা বাঁকানোও হতে পারে। বেশিরভাগ আরোরাতে সবুজ রঙ এবং গোলাপী রঙ দেখা যায়। তবে অনেকসময় লাল রঙ বা বেগুনী রঙের হতে পারে।
আরোরা সাধারণত দেখা যায় দক্ষিণ ও উত্তরের দেশগুলোতে। কানাডা, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, গ্রীনল্যান্ডের মতো দেশগুলোতে আরোরার দেখা মিলে। মানব ইতিহাস জুড়ে আরোরার রঙ গুলো রহস্যময়। আমাদের বায়ুমন্ডলের গ্যাসগুলোই হলো আরোরার বিভিন্ন রঙের কারণ। উদাহরণঃ আরোরার সবুজ রঙের কারণ হলো অক্সিজেন আবার আরোরার লাল এবং নীল রঙের জন্য দায়ী হলো নাইট্রোজেন গ্যাস।

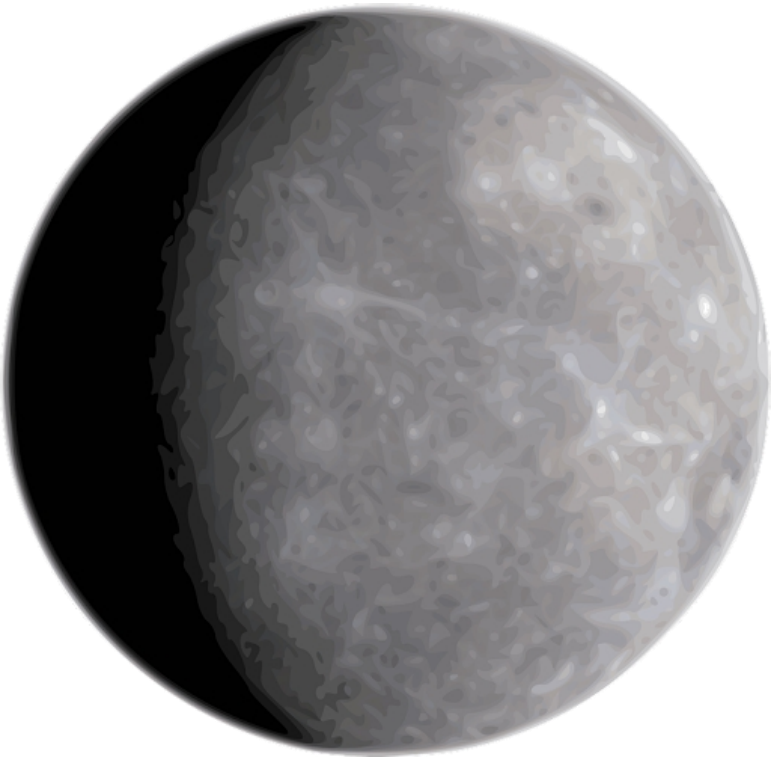

বুধ গ্রহ ছোট হয়ে যাচ্ছে !

আবিরা আফরোজা মুনা

সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধ । জানা আছে কি সবচেয়ে কাছের গ্রহ বুধ সৃষ্টির সময় থেকেই ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে? আগে যতটা ভাবা হতো, বাস্তবে তার চেয়েও অনেক বেশি কমেছে এর পরিধি!

প্রায় ৪০০ কোটি বছর ধরে চলছে এই ছোট হয়ে আসার প্রক্রিয়া। সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন, শুরুর সময় থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৭ কিলোমিটার কমেছে সৌরজগতের সবচেয়ে ভেতরের এই গ্রহটি। বিবিসি এক প্রতিবেদনে সোমবার এ তথ্য জানিয়েছে।

বুধ গ্রহ সম্পর্কে জানতে পাঠানো প্রথম নভযান 'মেরিনার-১০' বুধের পৃষ্ঠদেশের মাত্র ৪৫ ভাগের ছবি তুলতে সক্ষম হয়েছিল ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫ সালে। এরপর দীর্ঘদিন গ্রহটির বিষয়ে জানার ক্ষেত্রে বড় কোনো অগ্রগতি হয়নি। ২০০৪ সালে যাত্রা শুরুর পর ২০১১ সালে বুধের কক্ষপথে স্থাপন করা হয় নভোযান মেসেঞ্জারকে। তখন থেকেই গ্রহটির নানা দিকের ছবি তোলা এবং এর সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে আসছে মেসেঞ্জার। পৃথিবীর উপরিতলের সঙ্গে বুধের উপরিতলের একটি বড় পার্থক্য হলো, পৃথিবীপৃষ্ঠ অনেকগুলো টেকটোনিক প্লেট দিয়ে গঠিত হলেও বুধপৃষ্ঠ গঠিত মাত্র একটি টেকটোনিক প্লেট দিয়ে। বুধের এই পৃষ্ঠদেশকে বলা হয় 'লিথোস্ফিয়ার'। এতে ৫ থেকে ৫৫০ মাইল পর্যন্ত দীর্ঘ ফিতার মতো বেশ কিছু এবড়োখেবড়ো অংশ আছে। এর কোনো কোনোটি আবার ৩ দশমিক ২ কিলোমিটার উচ্চতার।

যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার মহাকাশ যান ‘মেসেঞ্জার’ থেকে পাঠানো তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গবেষণাটি পরিচালিত হয়। ওয়াশিংটনের কার্নেগি ইনস্টিটিউশনের পল কে বার্নি এবং ক্রিস্টিয়ান ক্লিমস্যাক গবেষক দলটির নেতৃত্ব দেন। নেচার জিওসায়েন্স সাময়িকীর সর্বশেষ সংখ্যায় এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে।গবেষণা প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, নতুন তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে এখন যে সিদ্ধান্তে আসা গেছে তাতে বুধগ্রহের বিবর্তন নিয়ে থাকা একটা আপাতরহস্যেরও সমাধান হলো। বুধের পৃষ্ঠদেশের আগের সব ছবি থেকে ধারণা করা হতো, শীতল হওয়ার প্রক্রিয়া সত্ত্বেও গ্রহটি খুব একটা সংকুচিত হয়নি। কিন্তু গ্রহটির সৃষ্টির প্রক্রিয়া এবং এর বয়স বাড়ার বিষয়টির সঙ্গে ওই ধারণা খাপ খেত না।

এখন বিজ্ঞানী পল কে বার্নি এবং ক্রিস্টিয়ান ক্লিমস্যাকের নেতৃত্বে গবেষকেরা নভোযান মেসেঞ্জারের ছবি এবং টপোগ্রাফিক তথ্য-উপাত্ত থেকে গ্রহটির টেকটোনিক গঠন সম্পর্কে একটি বিস্তারিত বিবরণ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এতে দেখা গেছে, শীতল হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহটির অভ্যন্তর ভাগ যে পাথর এবং ধাতু দিয়ে গঠিত, সেগুলোও সংকুচিত হয়েছে। ফলে, পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ সবদিকেই ছোট হয়ে যাচ্ছে বুধ। তার পিঠে তৈরি হয়েছে এক বিরাট উপত্যকা। যাকে বলা হচ্ছে গ্রেট ভ্যালি। যেটি আমেরিকার অ্যারিজোনায় গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের চেয়েও বড়। গভীরতায় বুধের সেই উপত্যকাটি পূর্ব আফ্রিকার গ্রেট রিফ্ট ভ্যালির চেয়েও বেশি। এটি লম্বায় ৬২০ মাইল (১০০০ কিলোমিটার), চওড়ায় ২৫০ মাইল (৪০০ কিলোমিটার) এবং গভীরতায় ২ মাইল (৩.২ কিলোমিটার)৪৬০ কোটি বছর আগে বুধের জন্মের পর গ্রহটি খাটো হয়েছে ১.২ থেকে ২.৫ মাইল বা দুই থেকে চার কিলোমিটার।

তথ্যসূত্র

https://www.prothomalo.com/amp/life-style/article/170782/%E0%A6%9B%E0%A7%8B%E0%A6%9F-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%A7?fbclid=IwAR2V0Rm4CRJ-D0Leux1tz78gJ5hv0_y7u_-fcJ_Le8KcpqQNGEp7sDGR8Pw